লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৮ বর্ষ ■ ১০ম সংখ্যা

৩০ নভেম্বর, ২০০৫ ঈসাব্দ

সম্পাদকীয়

তাহ্‌রীকে জাদীদের পটভূমি ও গুরুত্ব

ধর্ম জগতের সূচনালগ্ন হযরত আদম (আঃ)-এর যুগ থেকেই সত্যের বিরোধিতা হয়ে আসছে। মিথ্যার পূজারীরা সত্যান্বেষীগণের প্রত্যেকটি মিশনকে গোড়াতেই সমূলে উৎপাটিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে আসছে। কিন্তু পরিণামে তারা ব্যর্থতার গ্লানি ও যাতনা নিয়ে নিজেরাই এ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে সত্যান্বেষীগণ আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি "কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলী অর্থাৎ আল্লাহ্ ফয়সালা করে নিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি ও আমার রসূলগণই বিজয়ী হবো। (সূরা মুজাদালা-২২)" অনুযায়ী বিজয়ের একটির পর আরেকটি সোপান ডিঙ্গিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। এ যুগে সত্যান্বেষীদের দল জামাতে আহমদীয়ার ইতিহাসেও এর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীরা জামাতকে ধ্বংস করার সব ধরনের ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা করে আসছে। আর জামাতে আহমদীয়াও ঐশী ইঙ্গিত ও সমর্থনে একটির পর একটি মিশন (পরিকল্পনা) নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। তাহ্‌রীকে জাদীদ এরকম অনেকগুলো মিশনের একটি। ১৯৩৪ সনে "মজলিসে আহরার" জামাতে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। তারা সদর্পে ঘোষণা দেয়, জামাতে আহমদীয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে, কাদিয়ানের নাম পৃথিবী থেকে মিটিয়ে দিবে, কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নিবে। সে বছরই জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) জামাতে আহমদীয়াকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাহ্‌রীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। আর এ তাহ্‌রীক সম্পর্কে তিনি (রাঃ) বলেন–

"খোদার আরশকে যা প্রকম্পিত করে দিবে সেই জিনিসের নাম তাহ্‌রীকে জাদীদ।" (দৈনিক আল ফযল, খন্ড-৩০, পৃঃ-২৮০)

তিনি আরও বলেন– "তাহ্‌রীকে জাদীদ এ জন্য চালু করা হয়েছে যেন এর মাধ্যমে আমাদের কাছে ঐ পরিমাণ টাকা সঞ্চিত হয়, যাতে খোদাতাআলার নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পৌঁছানো যায়।" (জুমুআর খুতবা, ২৭ নভেম্বর ১৯৪৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) তখন আহমদীয়াতকে (সত্য ইসলামকে) পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে জামাতের সদস্যগণকে তাহ্‌রীকে জাদীদের ফান্ডে ৩ বছরে ২৭ হাজার টাকা জমা করার আহ্বান জানান। কিন্তু জামাত তখন খলীফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথম বছর ১ লক্ষ টাকা ও তিন বছরে ৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেছিল। বর্তমানে প্রতি বছর এ ফান্ডে জামাতের সদস্যগণ কোটি কোটি টাকা চাঁদা দিয়ে যাচ্ছেন। এ বছরও জামাত (২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে) ৩৪ লক্ষ ৪৩ হাজার পাউন্ড চাঁদা এ ফান্ডে দিয়েছেন। ভবিষ্যতে ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহ্‌রীকে জাদীদের ফান্ডের পরিধি আরো ব্যাপকভাবে বর্ধিত হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) এ মহান তাহ্‌রীক ও জামাতের সদস্যগণের অসাধারণ আত্মত্যাগের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব সাধিত হয়েছে। এ তাহ্‌রীকে জাদীদের কল্যাণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই জামাতে আহমদীয়া ভারতবর্ষের গন্ডি ছাড়িয়ে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর ১৮২ দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সদস্য সংখ্যা ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র আহমদীয়াত এক অতি পরিচিত নাম। অপরদিকে বিরুদ্ধবাদী সংগঠন মজলিসে আহরারের নাম-নিশানা পৃথিবী থেকে মিটে গেছে।

জামাতে আহমদীয়ার পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) গত ০৫/১১/২০০৪ইং এ মহান তাহ্‌রীকের পঞ্চম দফতরের ঘোষণা দিয়েছেন। আমাদের সামনে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ, এ মহান তাহ্‌রীকে শামিল হয়ে ইসলামের প্রচার ও সেবার করার। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে তাহ্‌রীকে জাদীদে বেশি বেশি কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভের তৌফীক দান করুন। আমীন।

৩০ নভেম্বর, ২০০৫ইং

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
• কুরআন শরীফ	৩
• হাদীস শরীফ	৪
• অমৃতবাণী	৫
• জুমুআর খুতবা ঃ তাহ্‌রীকে জাদীদ এর দপ্তর পান্‌জম-এর প্রথম বৎসরের উদ্বোধন ঘোষণা *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)* *অনুবাদ– মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী*	৬-১২
• জুমুআর খুতবা ঃ সত্য ও ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত হও আর খোদার জন্য সত্য সাক্ষ্য দান কর *হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)* *অনুবাদ– মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	১৩-১৮
• হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র *সংকলন– ইয়াকুব আলী ইরফানী* *অনুবাদ– মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ*	১৯-২০
• আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম *মূল– হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)* *অনুবাদ– মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান*	২১-২২
• মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) *মূল– হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)* *অনুবাদ– শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান*	২৩-২৪
• কিংবদন্তি মহাপুরুষ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) *সংকলন– মৌঃ এস. এম. তৌহিদুল ইসলাম*	২৫-২৬
• খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী *মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল*	২৭-২৮
• আহমদীয়ত *মূল– কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব ফাযেল* *অনুবাদ– মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান*	২৯-৩০
• আবেগ নয়, বিবেক চাই *মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (প্রাক্তন অধ্যাপক)*	৩১-৩২
• হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন নারী মুক্তির পথিকৃত *মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন*	৩৩-৩৪
• মুলাকাৎ *সংকলন ও অনুবাদ ঃ মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী*	৩৫-৩৭
• কবিতা	৩৮
• সংবাদ	৩৮

প্রচ্ছদ ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-কে জার্মানীতে ওয়াক্‌ফে নও কিশোর ফুলের তোড়া উপহার দিচ্ছে।

ছবি ঃ হাফিয়া তাসাদ্দক

কুরআন শরীফ

সূরা আত্ তাওবা

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝۷۳

৭৩। হে নবী! তুমি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর[১১৯৯] আর তাদের বিষয়ে কঠোর হও। এবং তাদের ঠাঁই হবে জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوْا ۚ وَلَقَدْ قَالُوْا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوْا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ۚ وَمَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰىهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ ۚ فَاِنْ يَّتُوْبُوْا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْاَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝۷۴

৭৪। তারা আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, তারা বলে নি, অথচ তারা নিশ্চয় কুফরীর কথা বলছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তারা কাফির হয়ে গেছে। আর তারা এমন বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করেছিল যা তারা পূর্ণ করতে পারে নি। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজ অনুগ্রহে ও তাঁর রসূল[১২০০] তাদেরকে সম্পদশালী করে দেয়ার কারণেই তারা (মু'মিনদের প্রতি) বিদ্বেষী হয়েছে, অতএব তারা তওবা করলে তা হবে তাদের জন্য উত্তম। তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে ইহকাল ও পরকালে আল্লাহ্ তাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। এবং পৃথিবীতে তাদের কোন বন্ধু থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও হবে না।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَىِٕنْ اٰتٰىنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝۷۵

৭৫। আর তাদের মাঝে এমন একদলও আছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে অঙ্গীকার করেছিল, 'তিনি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ থেকে কিছু দান করলে অবশ্যই আমরা (আল্লাহ্‌র পথে) দান খয়রাত করবো এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবো।'

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝۷۶

৭৬। এরপর তিনি যখন নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে দান করলেন তখন তারা এতে কার্পণ্য করতে আরম্ভ করলো এবং অজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিল।

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝۷۷

৭৭। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আর তাদের মিথ্যা বলার কারণে তিনি শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তরে কপটতা সেদিন পর্যন্ত বদ্ধমূল করে দিলেন যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে।

১১৯৯। 'জেহাদ' (অনির্দিষ্ট নাম বাচক বিশেষ্যপদ, মূল জাহাদা-অর্থ সে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম করেছিল) শব্দটি কুরআন করীমে সাধারণতঃ উক্ত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রসূল (সঃ) কীরূপে সংগ্রাম করতে নির্দেশিত হয়েছিলেন এর কোন উল্লেখ নেই। এছাড়া এমন কিছুর ইংগিতও নেই যাতে তরবারির সাহায্যে সংগ্রাম করা বুঝায়। প্রকৃত ঘটনা হলো, নবী করীম (সঃ) মুনাফিকদের বিরুদ্ধে কখনোই যুদ্ধ করেন নি।

১২০০। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমনের পরে মদীনা শহরের অনেক উন্নতি হয়েছিল, এটা ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং মদীনার অধিবাসীরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলেন।

হাদীস শরীফ

ধৈর্য

হাদীস

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যকে ধরাশাহী করে সে শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে। (বুখারী)

মুআয ইবনে আনাস (রাঃ) বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ প্রদর্শনের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে তাকে আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন সব মানুষের ওপর মর্যাদা দিয়ে ডাকবেন। (তিরমিযী)

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সঃ) কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন, তিনি (সঃ) বললেন, রাগ করো না।

ব্যাখ্যা

আল্লাহ্তাআলা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন এবং এর উত্তম প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন। ধৈর্য মানবীয় গুণাবলীর বিকাশের এক অনন্য সোপান। এর মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ও প্রকাশ ঘটে। মানবীয় চরিত্রের মাঝে যে বৈচিত্র ও বৈপরিত্য আছে তা একমাত্র ধৈর্যের মাধ্যমে সুশোভিত ও সুন্দর করা যায়। তাই আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী রসূলের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের সকলেই ধৈর্যের চরম দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে মানব জাতিকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন আদর্শবান ও সুন্দর মানুষ হতে হলে ধৈর্যকে নিজেদের জীবনের অংশ বানাও।

কুরআন মানুষকে মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সকল পথ দেখিয়ে দিয়েছে। উপরের আয়াতে আল্লাহ্তাআলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন ধৈর্য ধারণ কর। তোমাদের জীবনে ধৈর্যচ্যুতির বহু ঘটনা ঘটবে কিন্তু তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। এর ফলে তোমাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে।

আঁ হযরত (সঃ) হাদীসগুলিতে ধৈর্যচ্যুতির সবচেয়ে বড় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর তা হলো রাগ। ক্রোধ মানুষকে উন্মাদ করে দেয় এবং এমন সব কাজে লিপ্ত করে যা ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয়। হযরত নবী করীম (সঃ) নসীহত ও তাকিদ করেছেন আমরা যেন রাগ না করি। বরং ধৈর্য ধারণ করি। মানব জীবনে অনেক ক্ষেত্রে রাগের মুখোমুখি হতে হয়। আর এমন পরিস্থিতিতে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কাজেই এমন পরিস্থিতি যার ফলে ব্যক্তি, পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, আমাদের সকলেরই উচিত এমন অবস্থায় আমরা যেন ধৈর্য ধারণ করি এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সর্বাবস্থার মুকাবিলা করি। আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ

মাওলানা সালেহ্ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আদর্শ

এই যুগে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের আদর্শ দেখানো প্রয়োজন।

এখন এই যুগে যেথায় আমরা বসবাস করছি যুদ্ধের অভ্যন্তরীণ নমুনা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল এবং আধ্যাত্মিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এর উদ্দেশ্য। কেননা বর্তমানে বিভেদ ও ঐক্যের প্রচারের উদ্দেশ্যে বড় বড় উপকরণ ও অস্ত্রসস্ত্র তৈরী করা হয়েছে। সুতরাং এর প্রতিদ্বন্দ্বীতায়ও অনুরূপ অস্ত্রসস্ত্রের প্রয়োজন। কারণ এটা শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ এবং সর্বপ্রকার সুবিধা ও নিরাপত্তা আমরা ভোগ করছি। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের ধর্মের প্রকাশ, প্রচার এবং সব করণীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারছে। তাছাড়া ইসলাম, যা নিরাপত্তার সত্যিকার পৃষ্ঠপোষক বরং প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা, শান্তি ও মিলনের প্রচারকই হলো ইসলাম। এটা কেমন করে এই নিরাপদ ও আযাদীর যুগে তার অতীত আদর্শ প্রদর্শন করাকে ।ন্দ করতে পারতো? সুতরাং বর্তমানে সেই ।তীয় আদর্শটির অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সংগ্রাম-এর প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে জেহাদ

আরো একটি কথা আছে, আর তা হলো, ঐ প্রথম নমুনা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয়ও বিবেচ্য ছিল। অর্থাৎ বীরত্ব প্রদর্শনও এর উদ্দেশ্য ছিল যা কিনা তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে অধিক প্রশংসিত, প্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করা হতো। আর বর্তমানে তো যুদ্ধ একটা কৌশলরূপে গণ্য হচ্ছে। দূর থেকেও একজন লোক আগ্নেয়াস্ত্র ও বন্দুক চালনা করতে পারে। কিন্তু সেখানে ঐ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বীরপুরুষ মনে করা হতো যে সাহসিকতার সাথে তরবারির সম্মুখীন হয়ে যেত। কিন্তু আজকাল যুদ্ধ কৌশলতো কাপুরুষতাকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এখন বীরত্বের কোন প্রয়োজন নেই বরং যার আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও নতুন আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি রয়েছে এবং ওগুলো যে চালাতে পারে সে সফলতা অর্জন করতে পারবে। মু'মিনদের সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশই ছিল সেকালের যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর খোদাতাআলা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অতি উত্তমরূপে দুনিয়াতে এর বিকাশ ঘটিয়েছেন। বর্তমানে আর তার প্রয়োজন নেই। কারণ বর্তমান কালে যুদ্ধ-দক্ষতা কৌশল আর চোখে ধূলা দেয়ার রূপ ধারণ করেছে এবং নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্র ও জটিল কৌশলাদি ঐ অমূল্য ও গৌরবময় বীরত্বকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আত্মরক্ষামূলক ও সম্মুখ যুদ্ধের এ কারণেও প্রয়োজন দেখা দিত যে, ইসলাম প্রচারকগণকে যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তরবারী দ্বারা দেয়া হতো। কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের ঐ জবাবের প্রতি উত্তরে তরবারীর সাহায্য নিতে হতো। কিন্তু আজ তরবারীর দ্বারা জবাব দেয়া হয় না বরং কলম ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা ইসলামের চিদ্রান্বেষণ করা হয়ে থাকে। আর এ কারণেই এ যুগে আল্লাহ্‌তাআলা চেয়েছেন যে, (সায়েফ) তরবারীর কাজ কলম দ্বারা নেয়া হোক। লিখিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিরুদ্ধবাদীগণকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে। আর এ কারণেই বর্তমানে কলমের জবাব তরবারীর মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করা কারো পক্ষে সমীচীন নয়।

যারা এখনও তাহ্‌রীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করে নি তারা এবার তাহ্‌রীকে জাদীদ এর দফতর পান্‌জম-এ শামিল হবে। তাহ্‌রীকে জাদীদ এর দফতর আওওয়াল এর ৭১তম বৎসর, দফতর দোওম এর ৬১তম বৎসর, দফতর সোওম এর ৪০তম, দফতর চাহ্‌রম এর ২০তম বৎসর এবং দফতর পান্‌জম এর প্রথম বৎসর এর উদ্বোধন ঘোষণা করা হল।

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৫ই নভেম্বর, ২০০৪ তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল ইমরানের ৯৩ আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা এরশাদ করেন।

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ۝

অনুবাদ ঃ তোমরা পুণ্য অর্জন করতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালবাস তা হতে খরচ করবে না ; এবং তোমরা যা খরচ কর নিশ্চয় আল্লাহ্ তা ভাল করেই জানেন।

প্রতি বছর ১লা নভেম্বর থেকে তাহ্‌রীকে জাদীদের নতুন বছর আরম্ভ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ নভেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় জুমুআর খুতবায় নববর্ষের ঘোষণা দেয়া হয়। নবাগত এবং নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা হয়ত তাহ্‌রীকে জাদীদের ইতিহাস ভাল জানেন না। তাই এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে চাই।

১৯৩৪ইং সনে তাহ্‌রীকে জাদীদ আরম্ভ হয়েছিল। ঐ বছর 'মজলিসে আহরার' আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে বিরাট ফেৎনা-ফাসাদ এবং শোরগোল সৃষ্টি করেছিল। বিরোধীরা ঘোষণা করেছিল, তারা পৃথিবীর বুক থেকে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে। কাদিয়ানের নাম পর্যন্ত মুছে ফেলবে। কাদিয়ানের প্রত্যেকটি ইট গুঁড়িয়ে দিবে। বেহেশ্‌তী মাকবেরা, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মাযার ও অন্যান্য পবিত্র স্থানের বেহুরমতী (অসম্মানি) করবে, সে সময়ের সরকার আমাদের সমর্থন তো দূরের কথা বিরোধীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল বলেই মনে হয়। ঐ দুর্যোগপূর্ণ দিনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) তাঁর প্রিয় জামাতকে একটা ফান্ড প্রতিষ্ঠার তাহ্‌রীক (আহ্বান) করলেন। কিছু পরিমাণ টাকা পয়সা জমা করতে বললেন। তিনি বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের আন্দোলনের কারণ এই যে, আমরা আহমদীয়াতের পয়গাম (বার্তা) সঠিকভাবে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে পারি নি। যেভাবে তবলীগ পৌঁছানো উচিত ছিল সেভাবে পৌঁছানো হয় নি। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌঁছানো প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেভাবে করা হয় নি। অতএব, এ বিষয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আহমদীয়াতকে সকল দেশে প্রচার করা যায়। এ উদ্দেশ্যে একটা পৃথক ফান্ডে প্রথম পর্যায়ে তিন বছরে ২৭ হাজার টাকা জমা হওয়া চাই। আপনারা মালি (অর্থ) কুরবানী করুন।

কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার হাম্‌দে-(প্রশংসায়) মন ভরে যায় যে,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রিয় জামাত যেখানে তিন বছরে ২৭ হাজার টাকা জমা করার কথা, সেখানে প্রথম বছরেই এক লক্ষ টাকা উক্ত ফান্ডে জমা করে দেয় এবং তিন বছরে চার লক্ষ টাকার বেশি মালি কুরবানী (অর্থ কুরবানী) প্রদান করে। আজ সেই যুগের সেই টাকার কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। সেদিন এক একটি টাকার অনেক মূল্য ছিল আজ তো এক পাউন্ড একশ দশ টাকার সমান। এজন্য বুঝা কঠিন। সেদিন আহমদীদের আর্থিক অবস্থা এমন ভাল ছিল না যে তাদের ধনী বলা যেতে পারে। বরং তারা তো ২আনা ৪ আনা বা ১/২ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। এরাই সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলেন। নিজেদের নিত্যদিনের আহার কম করে, সন্তানদের শুকনো রুটি খাইয়ে টাকা বাঁচিয়ে ঐ টাকা যুগ খলীফার আহ্বানে [তাহ্‌রীকে] চাঁদা দিয়েছেন।

(তারা মনে মনে বলেছেন) আজ আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র খলীফা তাহ্‌রীক করছেন যে, 'আস, আনসারুল্লাহ্ হও; নিজেদের জীবনযাত্রাকে অত্যন্ত সাধারণ, অনাড়ম্বর কর, টাকা কম খরচ কর। টাকা বাঁচিয়ে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ কর, আল্লাহ্‌র খাতিরে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর। কারণ শত্রুরা আজ চিন্তা করেছে যে, কাদিয়ানের ইটগুলো গুঁড়িয়ে দিবে, আহমদীয়াতকে সমূলে উৎপাটিত করবে, পবিত্র স্থাপনাগুলোর বেহুরমতি বা অসম্মান করবে।

এই ছিল সেই যুগের অবস্থা সেদিন আহমদীরা সামর্থ্যের উপরে গিয়ে বেশি বেশি মালি কুরবানী করেছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে ১৪/১৫ গুণ বেশি টাকা তারা খলীফার পায়ের কাছে এনে জড়ো করেছিলেন যেন তিনি আল্লাহ্‌র ধর্মের জন্য ব্যয় করেন। তাঁরা সেদিন আল্লাহ্‌র

প্রতি খুব সন্তুষ্ট হয়ে এ কাজ করেছিলেন। নতুবা আল্লাহ্ কি বলবেন? আল্লাহ্ বলতেন যে, আমি তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছিলাম তা তোমরা আমার প্রয়োজনের সময় লুকিয়ে রেখেছ? অথচ আমি জানি তাদের কাছে কি ছিল! তারা নিজেদেরকে কষ্টে রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে এ টাকা জমা করেছিলেন। কারণ তারা সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন যে এরই মাধ্যমে আমাদের বেঁচে থাকার উপায় হবে। আমাদের কাছে যা আছে তা অত্যন্ত কম।' কিন্তু তবুও তারা যা দিয়েছিলেন তা তাদের উত্তম উপার্জন ছিল। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, এভাবে আমরা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হতে পারব, যাদের কষ্ট দেখে আল্লাহ্তাআলা তাদের হেফাযতের জন্য দৌড়ে চলে আসবেন। আল্লাহ্র রাস্তায় যারা কুরবানী করেন তাদের কুরবানী বিফলে যায় না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর শিক্ষা যা মূলতঃ কুরআন মজীদেরই শিক্ষা এ কথা তাদের জানা ছিল। বলা হয়েছে ঃ "তোমরা যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় সম্পদ, উত্তম সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ কর, তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করতে পার না যা তোমাদেরকে মুক্তি (জান্নাত) পর্যন্ত নিয়ে যাবে।" (ফতেহ্ ইসলাম, পৃঃ ৬৩)

সারকথা এই যে, তারা এমন মানুষ ছিলেন যে, তাদের যথেষ্ট আর্থিক সচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও সেদিন আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছিলেন। তাদের মাধ্যমে হিন্দুস্থানের বাইরে আহমদীয়াতের প্রচার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আরম্ভ হয়েছিল। সেদিন যারা প্রচারক হয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই সেসব দেশে কয়েদি হয়ে কারাগারে অনেক দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। আহমদীয়াতের প্রচারের জন্য হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) সেদিন যে তাহ্রীক (তাহ্রীকে জাদীদ) করেছিলেন, এতে আহমদীরা সীমাহীন কুরবানী দিয়েছেন। প্রথমতঃ হুযূর (রাঃ) দশ বছরের জন্য এ তাহ্রীক (আন্দোলন) জারি করেছিলেন। প্রথম দশ বছরের জন্য হুযূর (রাঃ) সময় আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ্র ইচ্ছায় এ তাহ্রীক একটি চিরস্থায়ী ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে।

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমরা আহমদীয়াতের যে উন্নতি ও অগ্রগতি দেখছি, এসব সেদিনের ঐ সমস্ত মানুষের কুরবানীর প্রতিফলন। জামাতের উন্নতি ছাড়াও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনেও এ প্রতিফলন হয়েছে। ঐ যুগে যারা প্রথম বছরগুলোতে কয়েক আনা বা টাকা তাহ্রীকে জাদীদে চাঁদা আকারে দিয়েছিলেন আজ তাদের অধিকাংশদের সন্তানেরা খুবই ভাল অবস্থানে আছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। আর্থিক অবস্থা তাদের খুবই ভাল। খুব সম্ভব তাদের অনেকেই এমনও আছেন যে, এক এক জন ব্যক্তিগতভাবে একা ঐ পরিমাণ চাঁদা দেন, যে পরিমাণ টাকা ঐ যুগে তাহ্রীকে জাদীদের মোট বাজেট ছিল। কিন্তু তারপরও ঐ যুগে যারা মালি কুরবানী করেছেন তাদের কুরবানী ভুলা যাবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলে গেছেন, তাহ্রীকে জাদীদের প্রথম যুগে যারা চাঁদা দিয়েছিলেন তাদের চাঁদার হিসেবের খাতা বা হিসাব-বই চালু/খোলা রাখতে হবে। বন্ধ করে দেয়া উচিত হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে। তাদের সন্তানেরা এ কাজের দায়িত্ব নিবেন। তারা কখনও তাদের পূর্বপুরুষদের খাতা বন্ধ করবে না। প্রথম "পাঁচ হাজার মুজাহেদীনদের" (চাঁদাদাতাদের) চাঁদা জারি রাখতে হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেছিলেন প্রথম পাঁচ হাজার মুজাহেদীনের চাঁদা জারি রাখতে, দু'বার হুযূর (রাহেঃ) তাদের সন্তানদের বলেছিলেন যে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর এবং সামনে এগিয়ে আস; নিজ বুযুর্গদের খাতা বন্ধ হতে দিও না। তাঁদের নামে প্রতি বছর চাঁদা জমা হতে থাকলেই তো তাদের নাম প্রতি বছর রেজিষ্টারে উঠতে থাকবে। কয়েক টাকা হবে হয়ত তাদের চাঁদা। কিন্তু তবু ঐ কয়েক টাকা যেন প্রতি বছর তাঁদের নামে আসতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নামে ঐ টাকা যেন (ঐ চাঁদা) প্রতি বছর আদায় হতে থাকে। ঐ যুগের বেশির ভাগ চাঁদাদাতারা (পাঁচহাজার মুজাহেদীন) পাঁচ/পাঁচ টাকা চাঁদা দিতেন। তাঁদের খাতা (চাঁদা) জীবিত রাখা এমন কঠিন কাজ নয়। হুযূর (রাহেঃ)এর তাহ্রীকের পর তাহ্রীকে জাদীদের কেন্দ্রীয় অফিস চেষ্টা চালিয়েছে। ফলতঃ প্রায় তিন হাজার চারশ' খাতা পুনরায় জীবিত হয়েছে! কিন্তু আবার অবহেলা হয়েছে। অনেকে বিদেশে চলে গেছে, আরো বিভিন্ন কারণে আবার কিছু কমে এসেছে। বহিঃর্বিশ্বের অফিসগুলোতে তাদের কোন উল্লেখ না থাকার কারণেও এমন হয়েছে। হয়ত বা কেউ কেউ বিদেশে হিসাব মত টাকা জমা দিয়েছে। কিন্ত কেন্দ্রে এর উল্লেখ হয় নি। অতএব, আজ সন্তানদের উচিত হবে রাবওয়ার সাথে যোগাযোগ করে নিজেদের বুযুর্গানের হিসাব জেনে নেয়া এবং আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। এখন তো প্রায় ২১০০ খাতা চালু আছে। বাকী খাতাগুলো চালু করতে হবে। এ ব্যাপারে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেছিলেন, প্রথম পাঁচ হাজারের মধ্যে যে সমস্ত খাতা কেউ খুলে রাখছে না বা খাতা চালু হচ্ছে না ঐ সমস্ত খাতাগুলোর মধ্যে এক হাজার খাতা হুযূর (রাহেঃ) স্বয়ং নিজ থেকে চাঁদা দিয়ে চালু রাখবেন। বাকীগুলোর জন্য জামাত চেষ্টা করবে। এক্ষেত্রে কেবল পাঁচ টাকা দিয়ে এক একটি খাতা চালু রাখা যেতে পারে। টোকেন-মানি আকারে। যদি ঐ সকল মুজাহেদীনদের সন্তানরা এগিয়ে না আসেন তাহলে হুযূর (রাহেঃ) পরে তাঁর সন্তানরা এ দায়িত্বভার বহন করবে। ইনশাআল্লাহ্। হুযূর (রাহেঃ) বলেছিলেন, ভবিষ্যতে এমন আরো মানুষ আসবেন যারা ঐ সমস্ত খাতা জীবিত

আজ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমরা আহমদীয়াতের যে উন্নতি ও অগ্রগতি দেখছি, এসব সেদিনের ঐ সমস্ত মানুষের কুরবানীর প্রতিফলন। জামাতের উন্নতি ছাড়াও ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনেও এ প্রতিফলন হয়েছে। ঐ যুগে যারা প্রথম বছরগুলোতে কয়েক আনা বা টাকা তাহ্রীকে জাদীদে চাঁদা আকারে দিয়েছিলেন আজ তাদের অধিকাংশদের সন্তানেরা খুবই ভাল অবস্থানে আছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন। আর্থিক অবস্থা তাদের খুবই ভাল। খুব সম্ভব তাদের অনেকেই এমনও আছেন যে, এক এক জন ব্যক্তিগতভাবে একা ঐ পরিমাণ চাঁদা দেন, যে পরিমাণ টাকা ঐ যুগে তাহ্রীকে জাদীদের মোট বাজেট ছিল।

রাখার দায়িত্ব বহন করবেন। আমি যে সমস্ত খাতা জীবিত রাখার দায়িত্ব নিয়েছি আশা করি আমার সন্তানেরা আমার পরে এগুলো দায়িত্ব নবে।

ঘটনা যাই হোক, হয়ত অফিস আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি, বা হিসাব ঠিক রাখা হয় নি। হয়ত কেউ কেউ নিজ নামেই তার পূর্বপুরুষের চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অফিসের রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক খাতা এখনও খোলা হয় নি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) এর খেলাফতকালের একুশ বছরেও ওসব খাতা খোলা হয় নি।

আমি এখন তাহ্রীকে জাদীদ অফিসকে বলছি, এ সমস্ত খাতা বা চাঁদাদাতার হিসাব রেকর্ডপত্র আমাকে পাঠিয়ে দিবেন। আমি আশা করি পূর্বপুরুষদের খাতা এবং চাঁদা তাদের সন্তানেরা আদায় করবেন, জীবিত করবেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) র সন্তানেরাও ইনশাআল্লাহ্ ঐ এক হাজার খাতার চাঁদা দিয়ে যাবেন।

আর যদি তারা এ দায়িত্বভার বহন না করে তাহলে- এ দায়িত্বভার আমি বহন করব ইন্শাআল্লাহ্। যাদের খাতা বা হিসাব এখনও জীবিত হয় নি তাদের রেকর্ড আমাকে পাঠাবেন। আর যাদের খাতা জীবিত হয়নি তাদের সন্তানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। কিন্তু যাদের হিসাব কোনভাবে খোলা হবে না তাদের খাতা খোলা রাখার দায়িত্ব আমি নিজের উপর নিচ্ছি। ঐ হিসাবে যে হিসাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেছিলেন অর্থাৎ টোকেন মানি হিসাবে। আমি যতদিন জীবিত আছি, আমি এ দায়িত্ব পালন করব। আমার পরে আমার সন্তানদের আল্লাহ্ তৌফীক দিন। কিন্তু ঐ সকল মুজাহেদীন যাদের কুরবানীর ফল আজ আমরা উপভোগ করছি তাদের নাম অবশ্যই জীবিত থাকা উচিত। আল্লাহ্তাআলা তাদের সন্তানদের তৌফিক দান করুন।

স্মরণ রাখবেন, এ সমস্ত কল্যাণরাজি, এ সমস্ত আল্লাহ্র ফযল তাঁদের কুরবানীর প্রতিদান স্বরূপ যা আমরা পেয়েছি। অনুরূপভাবে আপনাদের আজকের কুরবানীর প্রতিদান আমাদের ও আপনাদের বংশধরেরা আগামীতে অনেক বেশি বেশি লাভ করবে। তাদের মাঝে এর প্রবাহ্ প্রবাহিত হতে থাকবে। একটি রেওয়ায়াতে আছে, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুরও দান করবে আল্লাহ্তাআলা তার এ কুরবানীকে ডান হাতে গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্তাআলা কেবল পবিত্র বস্তুই কবুল করেন; এবং ওটাকে বাড়াবেন, একদিন ঐ একটি খেজুর পাহাড় সমান খেজুরে পরিণত হবে। যেমন তোমরা ছোট গরুর বাছুর পালন কর এবং তা বড় হয়ে বড় গরু হয়।" (বুখারী কিতাবুয্ যাকাত)

এ তো আল্লাহ্র রসূল (সঃ) এর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে, 'আমি বাড়াতে থাকি। এত বেশি বাড়াতে পারি যে, সাতশ' গুণ অথবা আরো বেশি।" অতএব ভয় পাবেন না যে, এত বছরের পুরাতন খাতা (চাঁদার হিসাব) পুনরায় চালু করা (জানি না) কত বড় ব্যাপার! যত বছর পিছনে গিয়ে পান, তত বছর পিছনে যান এবং তা জীবিত করেন। তার পর দেখেন; আল্লাহ্র ফযল কি রকম আপনারা লাভ করেন। আপনার প্রতি আল্লাহ্র ফযল বৃদ্ধি পেতে থাকবে, আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারপর দেখবেন আপনার ইচ্ছা হবে যে, ঐ পুরাতন খাতার মধ্যে কোন একটি বছরের চাঁদা যেন অনাদায়ী না থেকে যায়। প্রতিটি বছরের চাঁদাই যেন আদায় হয়ে যায়।

আমাদের জামাতের প্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ; কারণ আমাদের স্ত্রীরাও আল্লাহ্র রাস্তায় খুব খরচ করেন। তারাও অনেক অগ্রগামী। নিজেদের প্রয়োজন, নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে পেছনে রেখে দেন। অনেকে এত ভাল হাতে খরচ করেন যে, ঘর-সংসারের খরচ নির্বাহ হচ্ছে, চাঁদাও দেয়া হচ্ছে। মনেই হয় না যে, প্রয়োজনীয় খরচের মধ্য থেকে আল্লাহ্র পথেও যাচ্ছে-সংসারেরও সব ঠিকমত চলছে।

যদি এমন কোন কোন ব্যক্তি দিতে থাকেন, দফতরের উচিত তাকে সাহায্য করা। কেবল ধারাবাহিকতাকেই শক্ত করে ধরে বসবেন না; নিয়ম কানুন বেশি শক্ত না করে যারা যারা তাদের পূর্ব পুরুষের পুরাতন খাতা খুলতে চান, পুনর্জীবিত করতে চান তাদেরকে করতে দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "প্রত্যেক সকালে দু'জন ফেরেশ্তা নাযেল হন। একজন বলেন, "হে আল্লাহ্! দাতাকে আরো দাও এবং এমন দানশীল আরো সৃষ্টি কর।" দ্বিতীয়জন বলেন, " হে আল্লাহ্! কৃপন, যারা দান করে না, সঞ্চয় করে রাখে তাদের ধ্বংস কর, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও" (বুখারী কিতাবুয যাকাত)

অতএব এ হাদীস তাদেরকে উৎসাহ যোগাচ্ছে যারা নিজ পূর্ব পুরুষ বুযুর্গদের কুরবানীকে স্মরণ রাখে নি। সতরাং নিজেদের ও পূর্বপুরুষদের চাঁদা প্রদানের প্রতি মনোযোগী হোন। দ্রুত সামনে অগ্রসর হোন। এবং ফেরেশ্তাদের দোয়াসমূহকে নিজেদের জন্য ধরে নিন। আপনাদের সন্তানরাও পূর্বপুরুষদের কুরবানীর বরকত প্রাপ্ত হোক। আপনাদের সন্তানদের এটাই সবচেয়ে বড় সম্পদ (ঐ দোয়াগুলো) যা আপনারা রেখে যাবেন।

হযরত ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, দু'ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে রশ্ক করা (আগ্রহ করা যে আমিও যদি এমন হতে পারতাম) উচিত না। এক ঃ এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দিয়েছেন এবং সেও আল্লাহ্র পথে প্রচুর খরচ করে। দ্বিতীয় ঃ এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ যাকে বড়, জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান বানিয়েছেন, বুদ্ধিমান বানিয়েছেন এবং সেও তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করে, মানুষকে জ্ঞানও শিক্ষাদান করে।" (বুখারী কিতাবুয যাকাত)

প্রথম যুগের মুজাহেদীনদের খাতা খোলা ছাড়া তারপরের ঘটনা এই যে, পরবর্তীকালের মুজাহেদীনরাও খুব ভাল কুরবানীর উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। জামাতের মধ্যে অনেক বড় বড় কুরবানীর উদাহরণ রয়েছে। জামাতের কুরবানীর নমুনা খুবই উল্লেখযোগ্য। বরাবর উত্তম উদাহরণ সৃষ্টি করে চলেছে। আল্লাহ্র ফযলে প্রতি বছর দ্রুত অগ্রগতি লাভ করছে। তবে এত বড় বড় উদাহরণ যেন পরবর্তীরাও কায়েম রাখে সে নসিহত করে যেতে হবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "যখন কোন গৃহিনী নিজ পরিবারের খাদ্য দ্রব্য থেকে কিছু আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে, এবং সেটা বিনষ্টের উদ্দেশ্যে নয়, তাহলে ঐ গৃহিনী পুণ্য লাভ করবে এবং তার স্বামীও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে।" (বুখারী কিতাবুয যাকাত)

কারণ ঐ টাকা তো তার স্বামীর ছিল। স্ত্রী যদি খরচ করেন তাহলে স্বামী স্ত্রী উভয়েই পুণ্যবান হচ্ছেন। আমাদের জামাতের প্রতি আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহ; কারণ আমাদের স্ত্রীরাও

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খুব খরচ করেন। তারাও অনেক অগ্রগামী। নিজেদের প্রয়োজন, নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে পেছনে রেখে দেন। অনেকে এত ভাল হাতে খরচ করেন যে, ঘর-সংসারের খরচ নির্বাহ হচ্ছে, চাঁদাও দেয়া হচ্ছে। মনেই হয় না যে, প্রয়োজনীয় খরচের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র পথেও যাচ্ছে–সংসারেরও সব ঠিকমত চলছে। কোন কিছুর অভাব বোধ হচ্ছে না। তারা দৈনন্দিন খরচের মধ্যে থেকে চাঁদার জন্য টাকা বের করে চাঁদা দিচ্ছেন। এমন স্ত্রীরা যেখানে সংসার চালাচ্ছেন সেখানে স্বামীরা আবার যেন অনুসন্ধান করতে না যান যে, স্ত্রী কোথা থেকে কিভাবে টাকা বের করে চাঁদা দিচ্ছেন দেখি? তারা যদি চাঁদা দিয়ে থাকেন তাহলে তাদের দিতে দেন। উপরোক্ত হাদীস অনুসারে স্ত্রীরা যদি দিতে পারেন তাহলে ভাল কথা, আপনার তো কোন কিছু কম হচ্ছে না! উভয়েই পূণ্য লাভ করছেন। যে সমস্ত গৃহিনীদের টাকা বাঁচানোর অভ্যাস নাই তাদেরও এমন অভ্যাস গড়ে তুলা উচিত।

কোন কোন গৃহিনী এমন যাদের বাজে খরচ করার অভ্যাস থাকে। তাদের উচিত বাজে খরচ না করা। অযথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তারা বাজে খরচ বা অপচয় করতে থাকে। অনেকে খরচও করে আবার সঞ্চয়ও রাখে। তারা যদি জামাতের চাঁদা দিতে থাকে আবার নিজেদের সংসারের জন্যও খরচ করে তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঘর-সংসারের জন্য অযথা অনেক বেশি টাকা খরচ করে যাওয়া এবং চাঁদার ব্যাপারে বলে দেয়া যে, চাঁদা দেবার মত টাকা নাই–এটা বড় ভুল। যে সব গৃহিনী বা মায়েরা খুব সাদাসিদে অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্থ তাদের চাঁদা দেবারও অভ্যাস থাকে। তাদের সন্তানদের মধ্যেও এ স্বভাব গড়ে উঠে। এমন সন্তানরাও যখন কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন আল্লাহ্‌তাআলা তাদের হাতেও বরকত রেখে দেন। তারা অতি সুন্দরভাবে ঘর-সংসারও চালাতে পারে আবার সাথে সাথে জামাতের চাঁদা দেবার তৌফীক পেতে থাকে।

কিন্তু এ কথাও এখানে বলে রাখি যে, কোন কোন গৃহে সচ্ছলতা আসার সাথে সাথে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে বাজে খরচ অনেক বেড়ে যায়। লোক দেখানোর নিয়্যতে খরচ করার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। এমন লোকদের আমি আবারও বলছি যে, এ দিকে তারা যেন দৃষ্টি দেয়। নিজেদের খরচ কম করে সাদাসিদা জীবন যাত্রার অভ্যাস করা উচিত। খুব সাধারণভাবে জীবন যাপনের ফলে মালি কুরবানীর সুযোগ বেশি পাওয়া যায়।

একবার আঁ হযরত (সঃ) হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) [হযরত আয়েশা (রাঃ)র বোন]কে নসিহত করেছিলেন, "আল্লাহ্‌র পথে গুনে গুনে খরচ কর না, নতুবা আল্লাহ্‌ও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন। নিজের টাকার থলির মুখ বন্ধ রেখোনা, নতুবা ঐ থলির মুখ বন্ধই থাকবে। যতদূর সম্ভব খরচ করতে থাকবে।" (বুখারী, কিতাবুয যাকাত)

আমাদের জামাতের সদস্যদেরও একথা স্মরণ রাখা জরুরী। যদি আমাদের লোকেরা নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বছরে এক টাকাও দিতে থাকে, তবুও অনেক কিছু হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এক পয়সাও না দেয় তাহলে তার জামাতে থাকা কি প্রয়োজন?"

আমি একটু আগেই বলেছি যে, জামাতে এমন সদস্য সংখ্যা অনেক যারা প্রাণ খুলে চাঁদা আদায় করে; আল্লাহ্‌র রাস্তায় অনেক খরচ করে। কিন্তু এমন লোকও অনেক যারা ভাল উপার্জন করেও চাঁদা কম দেয়ার অজুহাত খুঁজে। অনেকগুলো খরচ দেখিয়ে আসল উপার্জন (আয়) কম করে দেখায় এবং বলে যে, আমরা এর উপর চাঁদা দেব। বা এই আয় এর উপর হিসাব করে চাঁদা দেব। আমাদের তো আয় খুব কম, অবস্থা খুব খারাপ। তাদের চিন্তা করা উচিত, অকৃতজ্ঞতা বা নাশুকুর হওয়া উচিত না। ভাল অবস্থায় অকৃতজ্ঞতা বা নাশুকুরি করলে অবস্থা খারাপ হয়েও যেতে পারে। আল্লাহ্‌তাআলাকে তো ধোকা দেয়া যায় না। আল্লাহ্‌তাআলা তো বলেছেন, আমার জন্য ঐ জিনিস খরচ কর যা তোমার খুব পছন্দ। নিজের প্রয়োজনকে বেশি অগ্রাধিকার দিও না বরং মালি কুরবানী কর।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ "তোমরা কোনক্রমেই আল্লাহ্‌কে খুশি করতে পার না যতক্ষণ না নিজের খুশিকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিসর্জন না দাও। নিজের মনোরঞ্জন, নিজের মান-সম্মান, নিজের ধন-সম্পদ নিজের প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে কষ্ট স্বীকার না কর। তোমরা এমন কষ্টের জন্য প্রস্তুত হও যাতে তোমাদের সামনে মৃত্যুর দৃশ্য চলে আসে। তারপর তোমরা যখন মৃত্যুর দৃশ্য দেখার মত কষ্ট সহ্য করে যাবে তখন তোমরা আল্লাহ্‌র আদরের কোলে চলে আসবে। তখন তোমার ন্যায়-পরায়ণদের উত্তরাধিকারী হবে যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছেন। তখন সকল প্রকার নেয়ামতের দরজা তোমাদের জন্য খোলা হবে।.....যখন তোমাদের নফ্‌স (আত্মা) আল্লাহ্‌র খাতিরে মৃত্যু বরণ করবে (রূহানী মৃত্যু)। তখন তোমাদের মধ্যে সঙ্গী হয়ে থাকবেন। ঐ সমস্ত গৃহ বরকতপূর্ণ হবে যেখানে তোমরা থাকবে। ঐ সমস্ত দেয়ালের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে যেগুলো তোমাদের গৃহের দেয়াল হবে। ঐ শহর বরকতময় হবে যেখানে এমন মানুষ থাকবে।" (আল ওসীয়্যত রূহানী খাযায়েন ২০ খন্ড ; পৃঃ ৩০৭-৩০৮)

হযরত (আঃ) আরো বলেছেনঃ

"এ জাতির কর্তব্য সব সময় এ জামাতের সেবা করে যাওয়া। আর্থিক কুরবানীর দিক থেকে কোন প্রকার অবহেলা হওয়া উচিত না। দেখ, পৃথিবীর কোন সংগঠন চাঁদা ব্যতীত চলে না। হযরত নবীয়ে করীম (সঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং সকল নবীগণের যুগে চাঁদা তোলা হয়েছে। সুতরাং আমাদের জামাতের সদস্যদেরও একথা স্মরণ রাখা জরুরী। যদি আমাদের লোকেরা নিয়মিতভাবে প্রত্যেক বছরে এক টাকাও দিতে থাকে, তবুও অনেক কিছু হতে পারে। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ এক পয়সাও না দেয় তাহলে তার জামাতে থাকা কি প্রয়োজন?"

আবার বলেছেন ঃ

মানুষ যদি বাজারে যায় সেখানে শুধু শিশুদের খেলনা কিনেও কয়েক পয়সা ব্যয় করে; তাহলে এখানেও (কেন্দ্রে) যদি এক পয়সা আদায় করে তাতে কি সমস্যা হয়? খোরাক, পোষাক ইত্যাদিতে খরচ হয়; অন্যান্য আরো খরচ আছে; তখন ধর্মের জন্য কিছু খরচ করতে এত কষ্ট হবে কেন? দেখা গেছে, বিগত

কয়েকদিনে কয়েকশ' মানুষ বয়াত করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেউ তাদেরকে বলে নি যে, এখানে চাঁদা দিতে হয়! ধর্মের সেবা করা লাভজনক! **যে পরিমাণ কেউ কুরবানী করে সে পরিমাণ তার ঈমান শক্তিশালী হয়।**

যারা কখনও মালী কুরবানী করে না তাদের ঈমান সব সময় সংকটাপন্ন অবস্থায় থাকে। আমাদের জামাতের প্রত্যেকে যে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তাদের প্রত্যেকেরই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, 'আমি নিয়মিত এত টাকা চাঁদা দিব। (মাসে/বছরে এত টাকা করে দিতে থাকব) কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য এমন প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্‌তাআলা তার রিযকে বরকত দান করেন।"

অন্য একদিন হযরত (আঃ) বলেন ঃ
"অনেকে এমন আছে যারা জানেই না যে, চাঁদা তোলা হয়। এমন লোকদের বুঝিয়ে বলা উচিত যে, তুমি যদি আন্তরিকতার সাথে এ জামাতের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতে চাও তাহলে পাকা প্রতিজ্ঞা কর যে, এতটা চাঁদা অবশ্যই নিয়মিত দিয়ে যাবে। যারা ভাল করে জানে না তাদের বোঝাতে হবে যে, তারা যেন পুরোপুরি এ প্রতিজ্ঞা পালন করে। যদি তারা এতটুকু প্রতিজ্ঞা পালনও না করে তাহলে তারা জামাতে শামিল হয়ে কি উপকার পেতে পারে? কোন পূর্ণ মাত্রার কৃপণ যদি প্রতিদিন এক কড়িও নিজ মাল থেকে চাঁদার জন্যে পৃথক করে রাখে তাহলেও সে অনেক কিছু দিতে পারে। এক ফোটা এক ফোটা করে তো নদী হয়ে যায়। যদি কেউ চার রুটি খায় তবে তার উচিত সে যেন এক রুটি পরিমাণ পৃথক করে রেখে দেয় চাঁদার জন্য এবং এভাবে নিজেকে এবং নিজের মনকে অভ্যস্থ করতে পারে যে জামাতের জন্য কিছু না কিছু দিতেই হবে। আমাদের জামাতের মাধ্যমে চাঁদা প্রদানের এ প্রথা চালু হয় নি। বরং সকল নবীগণের যুগে প্রয়োজন মত চাঁদা জমা করা হতো।" [মলফূযাত ৩য় খন্ড;৩৫৮পৃঃ]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছেন, শিশুদের খেলনা কিনেও তো কিছু টাকা খরচ করা হয়। তবে ধর্মের জন্য কেন খরচ করা হবে না? আজও যখন শিশুদের জন্য খরচ করা হয় তখন তাদের বোঝানো বা শিখানো উচিত

> যারা আয় করে না; এদের জন্য জামাতের মধ্যে চাঁদার ব্যবস্থা আছে। তাহ্‌রীকে জাদীদ, ওয়াক্‌ফে জাদীদে এর ব্যবস্থা আছে। অতএব, শিশুদের মধ্যে অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের এসব তাহ্‌রীকে অংশগ্রহণ করা আবশ্যক। এ জন্য শিশুদের বার বার বলা উচিত, উপদেশ দেয়া উচিত। যখনই তাদেরকে খেলনার বা খানা-পিনার জন্য কোন টাকা দেন তাদের নসিহত করেন, তারা যেন এর থেকে কিছু টাকা সাশ্রয় করে তা জামাতের জন্য আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে বা চাঁদা দেয়।

সামনে ঈদ আসছে। ছেলেমেয়েরা ঈদী (ঈদের উপহার) পাবে। উপহার পাবে। নগদ টাকাও তারা পাবে। তাদের বলেন তারা যেন সেখান থেকে কিছু টাকা চাঁদা দেয়। এর ফলে তাদের মধ্যে চাঁদা দেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে চেতনা-বোধ সৃষ্টি হবে। দায়িত্ববোধও সৃষ্টি হবে। তারা চিন্তা করবে। বড় হয়ে তারা খুব সুচিন্তিতভাবে এ কর্তব্য বোধ অনুভব করবে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় মালি কুরবানী করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। হযরত (আঃ) নবদীক্ষিতদের সম্পর্কে বলেছেন যে, তারা বয়আত করে কিন্তু চাঁদা দেয় না। অতএব নবদীক্ষিতদেরও গোড়া থেকে বলে দেয়া উচিত যে, চাঁদা দেবার অভ্যাস করতে হবে। আল্লাহ্‌র আদেশ এই যে, ধর্মের জন্য ধনসম্পদ খরচ করতে হয়। এর পরে ঈমান শক্তিশালী হয়। তারও অভ্যাস হয়ে যায়। অনেককে বয়আতের সময় বা পরেও বলা হয় না যে, চাঁদা দিতে হয়। মালি কুরবানী করতে হয়। সুতরাং এটা খুবই জরুরী কথা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এদের ঈমান যে কোন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যারা মালি কুরবানী করে না। বর্তমান যুগে যখন হিন্দুস্তান ও আফ্রিকায় বিপুল পরিমাণ মানুষ নতুন বয়আত করেছে, প্রথম থেকেই যদি তাদের চাঁদা দেয়ার অভ্যাস করানো হত তাহলে আজ চাঁদার পরিমাণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পেত এবং তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকতো।

এবার আমি তাহ্‌রীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণার কথায় আসছি। নববর্ষের ঘোষণার সময় চাঁদার বর্তমান অবস্থা, চাঁদার পরিমাণ; চাঁদাদাতাদের সংখ্যা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তারপর নববর্ষের ঘোষণা হয়। এখানেও আমি প্রথমে ইতিহাসের কথা বলছি। তাহ্‌রীকে জাদীদের প্রথম যুগ দশ বছরের সীমিত সময়ের জন্য ছিল। ঐ যুগকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) "দফতরে আওওয়াল" বলেছেন। ১৯৩৪ইং সনে আরম্ভ হয়ে প্রথম দশ বছরকে "দফতরে আওওয়াল" (১ম দফতর) বলা হয়েছে। এখানে পাঁচ হাজার মুজাহেদীন (চাঁদাদাতা) ছিলেন। তারপর কাজের পরিধি ও প্রয়োজন অনুভব করে এর সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। প্রথম দশ বছরের পরের যুগকে 'দফতরে দোওম' নাম দেয়া হয়। আমি যা দেখলাম সে সময় দফতর দোওমের কোন সময়সীমা নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায় যে, হুযূর (রাঃ) দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যে, এভাবে "দফতর" বৃদ্ধি পেথে থাকবে এবং প্রত্যেক যুগ ১৯ বছরের হবে। কিন্তু হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) অসুস্থতার কারণে দফতর দোওম বন্ধ হয় নি। ১৯৬৪ সনে দফতর সোওম জারি হবার কথা ছিল। কিন্তু হয় নি। তারপর হযরত খলীফাতুল মসীহুস সালেস (রাহেঃ) ১৯৬৬ইং সনে দফতর সোওম জারি করেছেন। তিনি বলেছেন, দফতরে সোওম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)র যুগে আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল–তাই আমি একে ১লা নভেম্বর ১৯৬৫ইং থেকে আরম্ভ করছি। এভাবে এ দফতরও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) ৯ই নভেম্বর ১৯৬৫ইং ইন্তেকাল করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহুস সালেস (রাহেঃ) বললেন, 'আমি যেহেতু এটি পাঠ করেছি তাই আমিও পুণ্যের অংশীদার হব ইন্‌শাআল্লাহ্। যাহোক দফতর সোওম খেলাফতে সালেসার (তৃতীয় খেলাফতের) যুগের তাহ্‌রীক। তারপর ১৯ বছর পর ১৯৮৫ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)র যুগে দফতর চাহারাম জারি হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর দিক নির্দেশনা অনুসারে ১৯ বছর পর আজ নতুন দফতর জারি হবে। এ হিসাবে আজ দফতর চাহারামের ১৯ বছর পূর্ণ হয়েছে। অতএব, আজ থেকে দফতর পান্‌জম (৫ম দফতর) জারি হবে ইনশাআল্লাহ্ । আজকের পর যারা নতুন চাঁদাদাতা হবেন তাহ্‌রীকে জাদীদে তারা দফতর পান্‌জমের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেমন বলেছিলেন যে, নতুন আহমদীদের মালি কুরবানীর অভ্যাস করানো উচিত। এখন আমি ঐ সমস্ত আহমদীদের সম্পর্কে দফতরকে হেদায়াত দিচ্ছি যে, যারা ইতিপূর্বে তাহ্রীকে জাদীদে শামিল হয় নি তাদেরকে তাহ্রীকে জাদীদে শামিল করার চেষ্টা করবেন। এরা সবাই দফতর পান্জম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি যেমন ইতিপূর্বে বলেছি, তাদেরকে জানাতে হবে যে, মালি কুরবানী অবশ্য কর্তব্য। তাদেরকে বলতে হবে যে, 'তোমরা যে আহমদীয়াতের পয়গাম পেয়েছ সে তো তাহ্রীকে জাদীদে যারা অর্থ দিয়েছে তাদের কারণে হয়েছে, অতএব, তোমরা এখন এতে শামিল হয়ে যাও এবং এ পয়গামকে আরো আগে পৌছানোর জন্য যারা কুরবানী করে তাদের সাথে তোমরাও অংশগ্রহণ কর। আমার জানা আছে, হিন্দুস্থানে এবং আফ্রিকার অনেক দেশে অনেক বড় সংখ্যায় এমন আহমদী আছে যারা এখনও তাহ্রীকে জাদীদে অংশগ্রহণ করে নি, এদের এখন শামিল করবেন।

তারপর নতুন প্রজন্ম যারা পরে জন্ম গ্রহণ করেছে অর্থাৎ আজ তারা আহমদী শিশু সন্তান এবং ভবিষ্যতে যারা জন্মগ্রহণ করবে তাদের তরবিয়তের প্রতি নজর দিন। নিজেদের অলসতাকে দূর করুন। সকলকে মালি কুরবানীতে শামিল করুন। তারা যা-ই দিক না কেন, টোকেন হিসাবে যা দিতে পারে দিবে–তা দিয়েই তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করুন। আহমদী শিশুদেরকে শামিল করার জন্য পিতামাতাকে বলুন। বিশেষ করে ওয়াক্ফে নও শিশু কিশোররা যেন অবশ্যই শামিল হয়। আসলে তাতে প্রত্যেক নবজাতককে শামিল করা উচিত। কোন কোন আহমদীর ঈমান এত অগ্রগামী যে, কারো কারো সন্তান হচ্ছিল না তারা নিজেদের সন্তান (হবে আশা করে ওদের নামে জন প্রতি ১০০/- টাকা হিসাবে ৪০০/= টাকা তাহ্রীকে জাদীদে দেয়া শুরু করে দিয়েছে (পাকিস্তানের কথা)। কিছু কাল পরে আল্লাহ্র ফযলে তাদের কোলে সন্তান আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তারপর সন্তান হয়েছে এবং এখন তাদের চারজন সন্তান হয়েছে। যত জনের নামে তাহ্রীকে জাদীদে চাঁদা দিয়েছে তত জনই সন্তান হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা কখনও কখনও খুব দ্রুত নিদর্শন দেখান। যেমন আমি বললাম, চারজন সন্তানের নামে সামান্য কিছু টাকা মাত্র তারা দিয়েছিলেন। কিন্তু মহব্বতের সাথে দেয়া সামান্য টাকাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনেক বড় পুরস্কার লাভের কারণ হয়। জামাতের অনেকে এমন অনেক নিদর্শন দেখেছেন। তারপর এই চাঁদার বরকতেই আপনার ঘরবাড়ী ভরতেই থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) একবার বলেছিলেন, তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদার নেযাম (ব্যবস্থাপনা) ওসীয়্যতের নেযামের জন্য অগ্রদ্রুত স্বরূপ। অর্থাৎ এর দ্বারা ওসীয়্যতের নেযাম শক্তিশালী হবে। অর্থ কুরবানী বা মালি কুরবানীর অভ্যাস গড়ার ভিত্তি হবে। এটা আগে আগে চলবে, সংবাদ বাহক হয়ে চলবে। মানুষকে পয়গাম দিতে দিতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে যে, পেছনে আলীশান (মহামহিমান্বিত) নেযাম আসছে যার নাম

এখন আমি ঐ সমস্ত আহমদীদের সম্পর্কে দফতরকে হেদায়াত দিচ্ছি যে, যারা ইতিপূর্বে তাহ্রীকে জাদীদে শামিল হয় নি তাদেরকে তাহ্রীকে জাদীদে শামিল করার চেষ্টা করবেন। এরা সবাই দফতর পান্জম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আমি যেমন ইতিপূর্বে বলেছি, তাদেরকে জানাতে হবে যে, মালি কুরবানী অবশ্য কর্তব্য। তাদেরকে বলতে হবে যে, 'তোমরা যে আহমদীয়াতের পয়গাম পেয়েছ সে তো তাহ্রীকে জাদীদে যারা অর্থ দিয়েছে তাদের কারণে হয়েছে, অতএব, তোমরা এখন এতে শামিল হয়ে যাও এবং এ পয়গামকে আরো আগে পৌছানোর জন্য যারা কুরবানী করে তাদের সাথে তোমরাও অংশগ্রহণ কর।

'নেযামে ওসীয়্যত।" আমি পূর্বেও বলেছি ওসীয়্যতের নেযামের সাথে খেলাফতের নেযামের বড় গভীর সম্পর্ক আছে। ওসীয়্যতের ফলে মালি কুরবানীর মান উন্নত হতে থাকে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে মালি কুরবানীর অনুশীলন হয় তাহ্রীকে জাদীদের চাঁদার মাধ্যমে। তারপর মালি কুরবানীর মান উন্নয়নের সাথে সাথে (হুকুকুল ইবাদ) মানব সেবার মান উন্নত হতে থাকে। অতএব, এ দিকে সকল জামাতের পুরোপুরি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখুন আগামীতে যেন তাহ্রীকে জাদীদের ফলে ওসীয়্যতের নেযাম খুব মযবুত ভিত্তির উপর কায়েম হয়।

এবার আমি কতগুলো পরিসংখ্যান বলে তারপর দফতর আওওয়ালের ৭১ তম বৎসর; দফতর দোওমের ৬১তম বৎসর, দফতর সোওম এর ৪০তম দফতর চাহারমের ২০তম বৎসর এবং দফতর পান্জম এর পহেলা বৎসরের ঘোষণা করে দিচ্ছি। পুনরায় আমি আমার আকাঙ্খা ব্যক্ত করছি যে, দফতর দোওম, সোওম ও দফতর চাহারমের চাঁদাদাতারা নিজেদের বুযুর্গান মুজাহেদীনের তথা দফতর আওওয়ালের মুজাহেদীনর খাতা পুনরায় চালু করুন। মোট কথা, আমাদের জামাতের সাথে আল্লাহ্তাআলার যে আচরণ ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে (এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।) প্রতি বৎসর পূর্বের বৎসরের চেয়ে বেশি চাঁদা আদায় হয়েছে। জামাত বেশি করে চাঁদা দেবার তৌফীক পেয়েছে। এবারও আল্লাহ্ ফযল করেছেন, জামাত অসাধারণ কুরবানীর তৌফীক পেয়েছে। আল্লাহ্র ফযলে এ পর্যন্ত ১২৭টি দেশের আহমদীরা তাহ্রীকে জাদীদের কুরবানীতে অংশগ্রহণ করেছেন। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এ পর্যন্ত তাহ্রীকে জাদীদে মোট ৩১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউন্ড আদায় হয়েছে। গতবারের তুলনায় তিন লক্ষ ৪৮ হাজার পাউন্ড বেশি আদায় হয়েছে। দরিদ্রতা সত্ত্বেও পাকিস্তান পূর্বের মত প্রথম স্থান অধিকার করেছে। গতবারের মত আমেরিকাও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু গড়ে জন প্রতি আদায় এর দিক থেকে আমেরিকা প্রথম। এবার ইংল্যান্ডের জন্য শুভ সংবাদ আছে। আপনারা এবার অগ্রগতি লাভ করেছেন। পূর্বের তুলনায় ৩৫/% ভাগ বেশি আদায় করেছেন। "এ কুফর ভেঙ্গে গেছে"–বলা যাবে না বরং বলতে হবে। "আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে কসম ভেঙ্গে গেছে" বলা যাবে। মাশাআল্লাহ্ ব্রিটেন মালি কুরবানীর ময়দানে অনেক এগিয়েছে বলতে হবে। মসজিদ নির্মাণেও তারা অনেক টাকা ব্যয় করছেন। মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে আবার নতুন মসজিদের প্লান নেয়া

হচ্ছে। আল্লাহ্ সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। সমগ্র পৃথিবীর সকল মালি কুরবানীকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। তাদের অর্থ সম্পদ ও জান-মালে বরকত দান করুন।

সকল দিক থেকে (১) প্রথম পাকিস্তান তারপর (২) আমেরিকা (৩) ব্রিটেন (৪) জার্মানী (৫) কানাডা। তবে জার্মানীর চেষ্টা করে যাওয়া উচিত: কানাডারও চেষ্টা করতে থাকা উচিত। (৬) তারপর ইন্দোনেশিয়া, (৭) হিন্দুস্থান (৮) বেলজিয়াম (৯) সুইজারল্যান্ড (১০) অস্ট্রেলিয়া। তারপর মরিশাস, মধ্যপ্রাচ্য; সৌদি আরব। আবুধাবী। আফ্রিকার মধ্যে ঘানা উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ্তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। চাঁদাদাতাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট তাহ্রীকে জাদীদে অংগ্রহণকারীদের সংখ্যাও চার লক্ষ ১৮ হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে এবার ৩৪০০০ এর বেশি নতুন চাঁদাদাতা এসেছেন। এতে ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, ব্রিটেন, জার্মানী, কানাডা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। তবে আমি জানি দৃষ্টি দিলে, চেষ্টা করলে, আরো অনেক; বিশেষ করে নতুন আহমদীদের চাঁদার অভ্যাস করানোর উদ্দেশ্যে আরো অনেক বেশি আহমদীদেরকে শামাল করা যাবে। যদি বড় রকম চেষ্টা চালানো যায় তা'হলে ইন্শাআল্লাহ্ হাজার হাজার মানুষকে শামিল করা যাবে বরং লক্ষ লক্ষ আহমদীদের এখনও শামিল হবার সুযোগ আছে। চেষ্টার প্রয়োজন। পাকিস্তানের ভিতরের বিভিন্ন জামাতের মাঝে প্রতিযোগিতা চলে আসছে শুরু থেকে। তাদেরও জানবার আগ্রহ আছে যে কে কোন পজিশন লাভ করেছে। অতএব, তাদের পজিশন নিম্নরূপ ঃ (১) লাহোর (২) করাচী (৩) রাব্ওয়াহ্ তারপর (৪) রাওয়ালপিন্ডি (৫) ইসলামাবাদ (৬) ফয়সালাবাদ (৭) মুলতান, (৮) কোয়েটা (৯) সারগোধা (১০) গুজরানোওয়ালা। শেখপুরা; ডেরাগাযীখাঁন; নওয়াবশাহ্ ; উকাড়া। জেলার মধ্যে (১) শিয়ালকোট (২) মীরপুর খাস (৩) ভাওয়ালনগর (৪) পেশওয়ার (৫) ভাওয়ালপুর (৬) নারোওয়াল (৭) বদিন (৮) ঝিলাম (৯) সাংগড় (১০) ভিহাড়ী উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য দোয়ার আবেদন করতে চাই। এ দু' দেশে ফাসাদ সৃষ্টিকারীরা চরম বিরোধিতা শুরু করেছে। আল্লাহ্তাআলা আমাদের জামাতের হেফাযত করুন। বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ যাবত সে দেশের সরকার বড় বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আজকেও ঢাকার একটি মসজিদে বিরোধিদের আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল। শুধু পরিকল্পনা নয় বরং হাজার হাজার লোক জড় হয়েছিল। পুলিশ তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সরকার অনেক বেশি পুলিশকে নিয়োগ করেছিল। তাদের সাধ্য তো এতটুকুই যে, জান্নাত লাভের আশায় কুরবানী করতে আসে বটে। কিন্তু পুলিশ দেখে পালিয়ে যায়। অনেকে মোল্লাদের হাতে পড়ে অবুঝ হয়ে যায়। মোল্লারা তো সব সময় অন্যদেরকে সামনে এগিয়ে দেয় মরার জন্য। কিন্তু নিজেরা কখনও কুরবানী দিতে সামনে যায় না। যাহোক আল্লাহ্তাআলা বাংলাদেশের সরকারকে দৃঢ়তার সাথে পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ দিন। তারা যেন মোল্লাদের জালে জড়িয়ে না পড়ে। এখন পর্যন্ত তারা বড় বুদ্ধিমানের পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের জামাতের তো গালি শোনার অভ্যাস আছে। মার খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু কোন সরকার যদি নিজের গদী রক্ষার জন্য আহমদীদেরকে কষ্ট দেয় অথবা যারা আহমদীদের উপর অত্যাচার করে তাদের সাথে সহযোগিতা করে তাহলে অতীতের অভিজ্ঞতা এটাই; ভবিষ্যতেও ইন্শাআল্লাহ্

আমাদের জামাতের তো গালি শোনার অভ্যাস আছে। মার খাওয়ারও অভ্যাস আছে। কিন্তু কোন সরকার যদি নিজের গদী রক্ষার জন্য আহমদীদেরকে কষ্ট দেয় অথবা যারা আহমদীদের উপর অত্যাচার করে তাদের সাথে সহযোগিতা করে তাহলে অতীতের অভিজ্ঞতা এটাই; ভবিষ্যতেও ইন্শাআল্লাহ্ এটাই হবে যে, এমন সরকারকে আল্লাহ্তাআলা ক্ষমতায় থাকতে দিবেন না।

এটাই হবে যে, এমন সরকারকে আল্লাহ্তাআলা ক্ষমতায় থাকতে দিবেন না। সুতরাং সেদেশের সরকারকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে। আল্লাহ্ করুন বাংলাদেশ সরকারকে আল্লাহ্ এভাবেই সৎ উদ্দেশ্যে নিজ কর্তব্য পালনের শক্তি দান করুন। আল্লাহ্ পাকিস্তানের সরকারকেও শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান করুন। বুদ্ধি বিবেক খাটানোর শক্তি দান করুন। অতীতে তাদের সাথে যা ঘটছে তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করুক, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখা উচিত।

সুতরাং রমযানের দিনগুলোতে, শেষ দশকে বিশেষ করে, খাস দোয়া করতে থাকবেন। যে সব দেশগুলোতে আহমদীয়া বিরোধী আন্দোলন চলছে তাদের জন্য দোয়া করবেন; যারা বড় কষ্ট করে মালি কুরবানীতে অংশ নিচ্ছেন তাদের জন্য দোয়া করবেন; আল্লাহ্ সকলকে উত্তম পুররস্কার দিন। তাহ্রীকে জাদীদের দফতর পান্জম এর আরম্ভ পবিত্র রমযানে, বরং শেষ দশকে আল্লাহ্ করেছেন, 'তিনি যেন এতে সীমাহীন বরকত দেন। আমার যে রকম আশা এতে প্রথম বছরেই লক্ষাধিক আহমদীরা অংশগ্রহণ করুক এবং এভাবে কুরবানীকারীদের সংখ্যায় অসাধারণ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হোক।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আল্লাহ্তাআলা আমার মধ্যে আপনাদের মঙ্গল কামনার অস্বাভাবিক জোস (উদ্দীপনা) সৃষ্টি করেছেন। আপনাদের ঈমান ও মারেফতের অগ্রগতির জন্য আমাকে পবিত্র মারেফত দান করা হয়েছে। এ সমস্ত ঐশী জ্ঞান মারেফত লাভ করা আপনাদের জন্য, আপনাদের সন্তানদের জন্য খুবই প্রয়োজন। আমি এর জন্য খুব প্রস্তুত হয়ে দন্ডায়মান হয়ে আছি যে, আপনারা আপনাদের পবিত্র উপার্জন থেকে আপনাদের ধর্মীয় অগ্রযাত্রার জন্য খরচ করুন। এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে আল্লাহ্তাআলা যতটা সামর্থ্য দিয়েছেন, আর্থিক সচ্ছলতা দিয়েছেন, সে যেন এ পথে ব্যয় করতে একটুও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ না করে। আল্লাহ্ ও রসূলের চেয়ে নিজের মাল (সম্পদ) কে অগ্রাধিকার না দেয়। তারপর আমি তো যতদূর আমার শক্তি সামর্থ্য আছে, আমার লেখার মাধ্যমে ঐ সমস্ত জ্ঞান ও বরকতের ভান্ডারকে এশিয়া এবং ইউরোপের দেশসমূহে ছড়িয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি ঐ পবিত্র রূহ-এর সাহায্যে যা আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন।"

(ইযালায়ে আওহাম; রূহানী খাযায়েন; ৩য় খন্ড; পৃঃ ৫১৬)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমাদের মিশনকে চিরদিন জারী রাখার তৌফীক দান করুন [আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন; ১৯ নভেম্বর ২০০৪ ইং']

অনুবাদ- মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সত্য ও ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত হও আর খোদার জন্য সত্য সাক্ষ্য দান কর

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৫ মার্চ, ২০০৪ তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতূহ, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্‌হুদ তাআব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দেন।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ
لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلٰى بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوٰٓى أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُٗا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٦﴾

অর্থ ঃ "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, তা (অর্থাৎ সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা পিতামাতার এবং নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক বা দরিদ্র হোক আল্লাহ্‌ই উভয়ের অভিভাবক। অতএব তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যাতে তোমরা ন্যায়বিচারকে পাশ কাটিয়ে যাও এবং তোমরা যদি পেঁচালো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত" (সূরা নিসা ঃ ১৩৬)।

আল্লাহ্‌তাআলা মু' মিনদেরকে কুরআন করীমে যে উন্নত চরিত্র ও উন্নত মর্যাদা আত্মস্থ করার প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন এদের একটি হলো সুবিচার ও ন্যায়বিচার। এর ওপর আমল করা, এতে প্রতিষ্ঠিত থাকা আর একে প্রয়োগ করা মু'মিনদের জন্যে ফরয। যেভাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে, অবস্থা যা-ই হয়ে যাক যেভাবেই হয়ে যাক তোমরা সুবিচার ও নিরাপত্তার আঁচল হাত থেকে ছাড়বে না। আর সব সময় সত্যের সাথী হবে।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে খৃষ্টানরা একবার এ অভিযোগ করে, নাউযুবিল্লাহ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নাকি কোন কোন স্থানে মিথ্যে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) অন্য আয়াত ছাড়াও এ আয়াতটিকেও উপস্থাপন করেন আর বলেন, এর পরও তোমরা কোন্ মুখে দাবী করতে পার, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ দিয়ে থাকবেন। তদুপরি খৃষ্টানদেরকে পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, সত্য কথা বলার জন্যেও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে কুরআন করীমে যে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে খৃষ্টানরা যদি ইঞ্জিল থেকে তা দেখাতে পারে তাহলে, তিনি (আঃ) বলেন, আমি বড় রকমের একটি পুরস্কার দেব। কিন্তু মোকাবেলায় আসার জন্যে কারও সাহস হয় নি। অতএব আমাদের ওপর আল্লাহ্‌তাআলার এটা বিশেষ অনুগ্রহ, এ যুগে তিনি আমাদেরকে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-কে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। তিনি (আঃ) আমাদেরকে কুরআন করীমে লুক্কায়িত এসব প্রজ্ঞার কথা ও যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্র দান করেছেন। কিন্তু এ অস্ত্র কেবল বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দেয়ার জন্যেই নয় বরং এটা একটা সুন্দর শিক্ষা। আমাদেরকে এতে আলোকিত হতে হবে। নিজেদের বাড়ী-ঘরের পর্যায়ে, নিজেদের মহল্লা পর্যায়ে, নিজেদের পরিবেশে আল্লাহ্‌তাআলার দেয়া এ সুবিচারের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে পৃথিবীকে আমাদের পথ দেখানোর সব দাবী অন্তঃসারশূন্য হবে।

প্রথম কথা তো এই, যে সাক্ষ্যই দেয়া হয় সব সময় এটা যেন দৃষ্টিপটে থাকে। যেভাবে সুবিচারের চাহিদা পুরো করার আদেশ রয়েছে প্রাণে খোদার ভয় বিরাজমান থাকলেই তা কেবল পূর্ণ হতে পারে। যখন এটা জানা যায়, আমাদের একজন খোদা আছেন যিনি আমাদের প্রকাশ্য ও গুপ্ত এবং লুকানো কথাও জানেন, আমাদের বর্তমান কর্মকান্ড সম্বন্ধেও যাঁর জানা আছে এবং ভবিষ্যতে আমাকে যা করতে হবে এরও খবর তিনি রাখেন–যখন এ চিন্তা-ভাবনার সাথে নিজেদের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করা হবে তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাকওয়ারও উন্নতি হবে আর তাকওয়ায় যখন উন্নতি সাধিত হবে তখন ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখার জন্যে, যেভাবে এ আয়াতে বলা হয়েছে–নিজে বা নিজের পিতা-মাতার বিরুদ্ধেও কখনও সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন পড়লে সাক্ষ্য দেয়ার সাহস সৃষ্টি হবে এবং সৌভাগ্য লাভ হবে।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ আলায়হিস সালামের প্রাথমিক যুগেও এমনই ঘটনার

সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজ পিতার পক্ষ থেকে রজু করা মোকদ্দমায় অন্যের অধিকার সংরক্ষণে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর (আঃ) পিতার সাথে জমিদারের কৃষাণদের গাছের মামলা ছিল, জায়গা-জমির বিবাদ ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হিস সালামের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, সুবিচার ও ন্যায়বিচার দেখে কৃষাণরা আদালতে বলে দিয়েছে, এসব গাছের ওপর তার পিতার অধিকার রয়েছে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যদি সাক্ষ্য দিয়ে দেয় তাহলে আমরা দাবী ছেড়ে দেব। মোকাদ্দমা উঠিয়ে নেব। আদালতে তাঁকে ডাকিয়েছে, উকিল তাঁকে বুঝানোর চেষ্টা করেছে। তিনি (আঃ) বলেছেন, আমি তো সত্য কথাই বলবো। কেননা, আমাকে তো অবশ্যই ন্যায়বিচার ও সুবিচারের চাহিদা পূরণ করতে হবে। অতএব তাঁর কথা শুনে আদালত সেসব মাযার সরদারদের পক্ষে ডিক্রী দিয়ে দিয়েছে। আর এ সিদ্ধান্তের পর হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) হাসতে হাসতে ফিরে এসেছেন যেন লোকেরা বুঝতে পারে তিনি মোকদ্দমায় জিতে ফিরে আসছেন। এটাই বাস্তব দৃষ্টান্ত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ পর্যায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আমাদেরকে শিখিয়েছেন। আর তিনি তাঁর জামাতের নিকট এটাই আশা পোষণ করতেন। এ শিক্ষাই দিয়েছেন, তোমাদেরকেও এ অবস্থান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে।

আল্লাহ্তাআলা এটাও বলেছেন, এমন কথা বলতে থাকবে না যার কয়েকটা অর্থ হতে পারে। এমন তাল গোল পাকানো কথাও যেন বলা না হয় যাতে সন্দেহের সুযোগ নিয়ে নিজের পক্ষে সিদ্ধান্ত করিয়ে নেয়া হয়। এভাবে যদি করা হয় তাহলে এটাও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী কাজ হবে। ন্যায়বিচারের বিপক্ষে যাওয়ার কথা হবে। তাই সবসময় সহজ সরল কথা বলার পথ অবলম্বন কর। সব সময় এমন সোজা ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কথা বল যাতে সুবিচার ও ন্যায়বিচারের সার্বিক চাহিদা পুরো হতে থাকে। আর ন্যায় বিচারের এ মান ও অবস্থান নিজেদের ঘরে, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সাথে ব্যবহারকালেও সমুন্নত রাখ, দৈনন্দিন জীবনেও প্রতিষ্ঠিত রাখ। নিজেদের কর্মচারীদের থেকে কাজ নিতে আর অধিকারসমূহ আদায় করতেও এ মান প্রতিষ্ঠিত রাখ, নিজেদের প্রতিবেশীর সাথে আচার-আচরণেও এ মান সমুন্নত রাখ, এমনকি অন্য স্থানে বলা হয়েছে,শত্রুর সাথেও ন্যায়বিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহ্তাআলা, যিনি তোমাদের কাজ-কর্মের সংবাদ রাখেন, তোমাদের অন্তরের অবস্থা অবহিত তোমাদের পূর্ণ সংকল্পের কারণে তোমাদেরকে উচ্চ নেয়ামতে ভূষিত করবেন। তখন দেখ, পৃথিবীতে সুবিচার, ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে এটা কত সুন্দর শিক্ষা!

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, সত্য ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্যি কথা বলাতে তোমাদের জীবন ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বা এতে তোমাদের মা বাবার ও নিকটাত্মীয়দের দুঃখ লাগলেও মিথ্যা কথা বলবে না (ইসলামী উসুল কি ফিলাসফি, পৃষ্ঠা ৫৩) অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও নিকটাত্মীয়দের ক্ষতি হলেও মিথ্যে সাক্ষ্য দিবে না।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেন, সত্য ও সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও। তোমাদের প্রত্যেক সাক্ষ্য খোদার উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্যি কথা বলাতে তোমাদের জীবন ক্ষতির সম্মুখীন হলেও বা এতে তোমাদের মা বাবার ও নিকটাত্মীয়দের দুঃখ লাগলেও মিথ্যা কথা বলবে না

আবার আল্লাহ্তাআলা বলেন, ওয়া ইযা কুলতুম ফা'দিলূ ওয়া লাও কানা যা কুরবা আর যখন তোমরা কথা বল তখন সেই কথাই মুখে নাও যা সর্বৈব সত্য এবং বিচারের কথা ; যদিও তোমরা নিজেদের কোন নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দাও না কেন। অর্থাৎ সুবিচার সমুন্নত রাখার জন্য তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত কল্যাণ দেখবে না অর্থাৎ তোমাদের প্রিয়দের ও নিকটাত্মীয়দের কল্যাণ দেখবে না বরং সত্য ও সঠিক কথা বলা উচিত।

আবার আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে আরও সুস্পষ্ট করে বলেছেন, ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানূ কূনূ কাওওয়ামীনা লিল্লাহি শুহাদায়া বিল কিসতি ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানা-নু কাওমি 'আলা আল্লা তা'দিলূ হুয়া আক্বরবু লিত্তাক্বওয়া ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খবীরুন বিমা তা'মালূন (সূরা মায়েদা ঃ ৯) অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো ! আল্লাহ্র খাতিরে দৃঢ়তার সাথে তত্ত্বাবধান করতে থেকে সুবিচারের সমর্থনে সাক্ষীতে পরিণত হও আর কোন জাতির প্রতি শত্রুতা অবশ্যই তোমাদের এ কথার ওপরে প্রস্তুত না করে যে, তোমরা সুবিচার না কর। ন্যায়বিচার করো, এটা তাকওয়ার সবচে' কাছাকাছি আর আল্লাহ্কে ভয় করো, তোমরা কর আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে ভালভাবে খবর রাখেন ।

এখন দেখুন সুবিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত রাখতে এর চেয়ে অধিক কোন স্তর হতে পারে যে, শত্রুর প্রতিও তোমরা অবিচার করবে না? তোমরা শত্রুর প্রতি অবিচার করলে ও ন্যায়বিচারের চাহিদা পূরণ না করলে এর অর্থ হবে, তোমাদের প্রাণে খোদার ভয় নেই। মুখ থেকে তো বলছো আমরা আল্লাহ্র বান্দা এবং আমরা তাঁকে ভয় করে থাকি; কিন্তু তোমাদের কাজ এর উল্টো সাক্ষ্য দিচ্ছে। কখনও কখনও আপষেও ছোট ছোট ঝগড়া হয়ে থাকে। ঝগড়ায় শত্রুর সাথে সুবিচারের আচরণ করার কথা থাকলেও কোথায় কখন এ কর্ম হয়ে থাকে? নিজেদের মাঝে ছোট খাট বিবাদে, ঝগড়ায়, অসন্তুষ্টিতে নিজেদের পরিবার বা পরিবেশে তৎক্ষণাৎ মামলাবাজী আরম্ভ হয়ে যায়। আর কখনও চূড়ান্ত কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়ে থাকে। সামান্য সামান্য কথায় থানা কাছারীতে ঘোরা ফিরা আরম্ভ হয়ে যায়। মোকদ্দমাবাজী আরম্ভ হয়ে যায় আর কখনও একে অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যও দিয়ে থাকে। আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন ভয়-ভীতি থাকে না। পরিপূর্ণভাবে শয়তানের কব্জায় চলে যেতে থাকে। আর ও নিজের মামলা সুদৃঢ় করার জন্যে জেনে বুঝে কোন কোন ত্রুটিপূর্ণ কথা-বার্তাও বলতে থাকে, মিথ্যা কথাও বলতে থাকে ; কিন্তু শয়তান এতটা সাহস দিয়ে দেয়, বলতে থাকে, দেখ, আমাদের সাথে ন্যায়বিচার করা হয় নি। আমাদের ওপর কোন খোদাও যে রয়েছেন তা ভুলে যায়।

আল্লাহ্তাআলা বলেন, তোমরা রহমান আল্লাহ্র বান্দা হতে চাইলে নেজেদের

মস্তিষ্ককে পরিপূর্ণভাবে পরিচ্ছন্ন কর। আর উদ্দেশ্য যেন হয় কেবল এবং কেবল সুবিচার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কোন জাতির শত্রুতাও তোমাদেরকে এ কথা থেকে যেন বাধা না দেয় যে, তোমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর। এ আদেশের কার্যকরী আকৃতি আমাদের কাছে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তে এভাবে দৃশ্যমান হয়ে থাকে। বর্ণনাটি এ রকম। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) উদ্ধৃত করেছেন ঃ একবার কয়েকজন সাহাবা (রাঃ)-কে বাইরে খবর পৌছানোর জন্যে পাঠানো হলো। কেননা, যুদ্ধাবস্থা ছিল। মুসলমানরা সংকটে ছিলেন। অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল। তখন শত্রুর কিছু লোকের সাথে হারাম শরীফের সীমায় দেখা হয়ে গেল। আর তারা অর্থাৎ মুসলমানরা মনে করলেন, এদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলে এরা মক্কায় গিয়ে খবর দিবে আর আমাদেরকে মেরে ফেলবে। এ চিন্তা করে তারা এদের ওপর আক্রমণ করে বসে এবং এসব কাফিরদের এক ব্যক্তিকে মেরেও ফেলে। যখন খবর সংগ্রহকারী এ দল মদীনায় ফিরে আসে তখন পিছনে পিছনে মক্কার লোকও এসে যায় আর বলে এভাবে এরা আমাদের দু'জন লোককে হত্যা করে চলে এসেছে–আর হারাম শরীফে মেরেছে। তাই যারা হারাম শরীফে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওপর আগে নির্যাতন করতে ছিলো তাদের তো জবাবে এটা পাওয়া উচিত ছিল, তোমরাও তো এ রকম কিছুই করে যাচ্ছ; কিন্তু তিনি (সঃ) তৎক্ষণাৎ কী ব্যবস্থা নেন? তিনি (সঃ) বলেন, তোমাদের সাথে অবিচার করা হয়েছে। সম্ভবত এসব লোক নিজেদের বিপদ মনে করে হারাম শরীফে চলে গেছে আর তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্যে পুরোপুরি চেষ্টা করে নি। তাদেরকে যুদ্ধে খুবই কম দেখানো হয়েছে। এর পর এদের দু'জনের রক্ত যারা প্রবাহিত করেছে (আরবদের মাঝে এরকম রীতি ছিল) তাদেরকে তিনি (সঃ) এ দু'জন নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হাতে সোপর্দ করে দেন (পরিশিষ্ট তফসীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা ১৪৯-২৫০)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেন, কূনূ কূওওয়ামীনা লিল্লাহি শুহাদায়া বিল কিসত্ব অর্থাৎ তোমাদের সাক্ষ্য আল্লাহ্তাআলার ন্যায়বিচারের সাথে হোক। আবার এ ব্যাখ্যা-ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানা-নু কূওমি 'আলা আল্লা তা'দিলূ অর্থাৎ কারও শত্রুতা যেন ন্যায়বিচারে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। যেমন এ যুগে কোন কোন আর্যসমাজী লোক তোমাদেরকে অফিসাদি থেকে বের করে দিতে চেষ্টা করতে থাকে। তোমরাও তাদের মোকাবেলায় এমন চেষ্টা করো–ইসলামের এ শিক্ষা নয়। আবার যেখানে তোমাদের অধিকার আছে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কর্মকান্ড আরম্ভ করো–না, এটাও হওয়া উচিত নয়। তিনি (রাঃ) আরও বলেন, আল্লাহ্তাআলা তাকওয়ার প্রতিকার এটা বলেছেন, তোমরা এ দৃঢ়বিশ্বাস রাখ তোমাদের কাজ-কর্মের পরিদর্শনকারীও এসব দেখারও কেউ আছেন (যমীমা বদর পত্রিকা, কাদিয়ান, ১৫ আগষ্ট ১৯০৯, হাকায়েকুল ফুরকান-এর ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮ এর বরাতে)। এভাবে তোমরা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তোমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাবে তোমাদের দেখার কেউ, তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে খবরা-খবর রাখার কেউ রয়েছেন। অতএব তখন এ উচ্চ মানের ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

আবার কোন কোন লোকের অভ্যাস রয়েছে, কোন কোন ব্যবসায়ী যারা কখনও কখনও খুব সতর্ক ও চালাকে পরিণত হয়ে থাকে। তারা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকের সাথে মিলে মিশে কারবার করে থাকে। কোন কোন গোবেচারা লোকের কাছে টাকা-পয়সা থেকে থাকে। এমন সাদাসিদা লোক এসব চালাক ও সতর্ক লোকের কথায় পড়ে যায় আর তাদের সাথে কারবারের এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যা পরিশেষে সর্বৈব ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আর গোটা পূঁজি তাদের থাকে এবং কাজের সকল দায়-দায়িত্বও তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়। আর অন্যপক্ষ ঘরে বসে কেবল মুনাফা পেতে থাকে। এমন সতর্ক লোকদেরও কিছুটা খোদাকে ভয় করা উচিত যেন লোকদের বোকা না বানিয়ে ফেলে। কোন কথায় যদি বোকা বনে গিয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্তাআলার সত্তা তো রয়েছেন, তিনি দেখছেন–এটা সবসময় দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক। তোমাদের মনে কী রয়েছে তা তো তিনি সবচে' ভাল জানেন। তাকওয়ার পরিপন্থী এমন চুক্তি কখনও করা উচিত নয়। কেননা, যখনই তোমরা এমন চুক্তি করে থাক তখন চুক্তিবদ্ধ লোকটি এমনই এক ব্যক্তি, পুরোপুরি অভিজ্ঞতা নেই এমন ব্যক্তিকে দিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করিয়েছে এবং বিনষ্ট করিয়েছে আসলেই সে ন্যায়বিচার ও সুবিচারকে গলা টিপে মেরে ফেলেছে। আবার কখনও এমন হয়ে থাকে, লোকদের এ অর্থ লুটে নিয়ে যায়। এরপর যখন এসব লোককে তাদের ভুল-ত্রুটি সম্বন্ধে বুঝানো হয়, এটা হওয়া উচিত নয়, এমন চুক্তিও করা সমীচীন নয়, তাকওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে এমন চুক্তি কর তখন তাদের উত্তর এটা হয়, দেখুন না, সে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছে। আমরা তার ওপর কোন্ পিস্তল ঠেকিয়ে তাকে মান্য করেছিলাম? এটা খুবই লজ্জার কথা! এমন ঘটনাও সামনে চলে আসে। কিন্তু অন্য লোক যারা এভাবে বোকামীর কারণে অর্থ বিনষ্ট করে থাকবে তাদেরও বুঝে শুনে পুঁজি খাটান উচিত। পরামর্শ করে, দোয়া করে, বুঝে শুনে, কোন লাভ হবে কি হবে না চিন্তা করা উচিত। বিনা কারণে বোকা বনে যাওয়া উচিত নয়। মু'মিনকে তো কিছুটা হলেও দূরদৃষ্টি দেখানো আবশ্যক।

কোন কোন লোক কর্জ নিয়ে থাকে এবং ফিরিয়ে দেয়ার সময় বাহানা তৈরী করতে থাকে। তাদের খোদার ভয় থাকা উচিত। এক হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবী হদর দালা সালমী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তার নিকট এক ইহুদীর ৪ দিরহাম পাওনা ছিল। এর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেই ইহুদী এসে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে, এ ব্যক্তির কাছে আমার ৪ দিরহাম পাওনা আছে আর সে আমাকে তা দিচ্ছে না। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ্কে বল্লেন, তার পাওনা তাকে ফিরিয়ে দাও। আব্দুল্লাহ্ পুনরায় সেই ওজর দেখালেন আর বল্লেন, আমি তাকে বলে দিয়েছি, আপনি আমাকে খবর পাঠাবেন এবং গনিমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দিবেন আর ফিরে এসে এ কর্জ চুকিয়ে দেব। তিনি (সঃ) বল্লেন, এখনই তার পাওনা আদায় কর। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন ৩ বার কোন কথা বলতেন তখন তা অকাট্য সিদ্ধান্ত হিসেবে মনে করা হতো। অতএব হযরত আব্দুল্লাহ্ সেই সময়েই বাজারে গেলেন। তিনি তহবন্দ (লুঙ্গি)

হিসেবে একখানা চাদর বেঁধে রেখেছিলেন। মাথার কাপড় খুলে তহবন্দের স্থানে বেঁধে নিলেন। আর চাদর ৪ দেরহামে বিক্রি করে কর্জ আদায় করে দিলেন। ইতোমধ্যে এক বুড়ি সেখান দিয়ে যাচ্ছিল আর বল্লো, হে আল্লাহ্‌র রসূলের সাহাবী! আপনার হলো কি? আব্দুল্লাহ্ তাকে গোটা ঘটনা শুনিয়ে দিলেন। তিনি (রাঃ) তখনই তার ঝুলিতে রাখা চাদর খানা দিয়ে দিলেন। আর এভাবে তার কর্জও শেষ হয়ে গেল এবং তার চাদরও তিনি পেয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ হাম্বল, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২২, বৈরুতে মুদ্রিত)।

এ সাহাবীকে দেখুন? তার কর্জ আদায় করার সামর্থ্যও ছিল না। তাকেও আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বল্লেন, কর্জ আদায় করতেই হবে। তোমার চাদর বিক্রি করে হলেও কর্জ আদায় করো তবেই অধিকার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, নফসে আম্মারার আকারে মুত্তাকীর যে অবস্থা হয়ে থাকে ন্যায়বিচারেরও সেই অবস্থা। এ অবস্থার সংশোধনের জন্যে ন্যায়বিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে। এতে নফস বা কুপ্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করতে হয়। যেমন কারো কর্জ শোধ করে দেয়ার কথা উঠালে কুপ্রবৃত্তি এতে এটাই পসন্দ করে যেন একে দাবিয়ে দেয়া যায় আর ঘটনাক্রমে এর মেয়াদও যেন কেটে যায়। এ প্রেক্ষিতে কুপ্রবৃত্তি আরও সাহসী ও দেনামুক্ত হবে এ বলে, এখন তো আইন অনুযায়ীও কোন ধর-পাকড় হতে পারে না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। ন্যায়বিচারের চাহিদা এই, তার ঋণ অবশ্যই যেন শোধ করা হয়। অর্থাৎ তার কর্জ আদায় করা হয় আর কোন কারণেও ওজর-আপত্তিতে চাপা না দেয়া হয়। তিনি (আঃ) বলেছেন, আমাকে দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, কোন কোন লোক এ বিষয়ের পরওয়াও করে না আর আমাদের জামাতেও এমন লোক আছে যারা নিজেদের কর্জ পরিশোধ করার ব্যাপারে খুব কমই দৃষ্টি দিয়ে থাকে।

এটা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এসব লোকদের জানাযা পড়তেন না অর্থাৎ জানাযার নামায পড়তেন না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকে এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখ, কর্জ শোধ করতে শিথিলতা দেখানো উচিত নয়। আর সব রকম অবিশ্বস্ততা ও বেঈমানী থেকে দূরে সরে পড়া উচিত। কেননা, এ বিষয়টি ঐশী শিক্ষার পরিপন্থী (মলফূযাত, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৭, রাবওয়ায় মুদ্রিত)।

একটি হাদীস রয়েছে। হযরত যহীর বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী রহমান খোদার ডান হাতে নূরের মেম্বরের ওপর থাকবে (আল্লাহ্‌তাআলার তো উভয় হাতই ডান হিসেবে গণনা করা হয়)। অতএব এসব লোক নিজেদের সিদ্ধান্তে ও নিজেদের পরিবার পরিজনের মাঝে আর তাদেরকে যাদের তত্ত্বধায়ক বানানো হয়ে থাকে তাদের মাঝে ন্যায়বিচার করে (মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ্)।

প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজেদের পরিবার পরিজনের তত্ত্বধায়ক। তাদের প্রয়োজনের প্রতি তাদের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। পুরুষকে পরিবারের কর্তা/অভিভাবক বানানো হয়েছে। ঘরের ব্যয় পুরো করা, সন্তান-সন্ততির লেখা-পড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সব রকমের প্রয়োজন ও ব্যয় পুরো করা–এসব পুরুষের দায়িত্বে।

এখানে আমি এখন ঘরের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষ নিজেদের পরিবার পরিজনের তত্ত্বধায়ক। তাদের প্রয়োজনের প্রতি তাদের দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। পুরুষকে পরিবারের কর্তা/অভিভাবক বানানো হয়েছে। ঘরের ব্যয় পুরো করা, সন্তান-সন্ততির লেখা-পড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সব রকমের প্রয়োজন ও ব্যয় পুরো করা–এসব পুরুষের দায়িত্বে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, জামাতেও কোন কোন পুরুষ এমন রয়েছে যারা ঘরের ব্যয় নির্বাহ করা তো দূরে থাক তারা উল্টো স্ত্রীদের কাছে নিজেদের জন্যে চেয়ে থাকে আর বলে আমাদের চাহিদা পূরণ করো। অথচ স্ত্রীদের আয়ের ওপর তাদের কোন অধিকার নেই। স্ত্রী কোন কোন ব্যয় নির্বাহ করলে এটাতো পুরুষের প্রতি অনুগ্রহ। অতএব পুরুষদের এ হাদীস অনুযায়ী সব সময় মনে রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্‌তাআলার রহমতের অংশ যদি পেতে হয়, আল্লাহ্‌তাআলার জ্যোতির অধিকারীতে পরিণত যদি হতে হয় তাহলে সুবিচারের চাহিদাকে পুরো করতে থেকে নিজেদের দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। সন্তান-সন্ততির দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে, এতে আনন্দের সাথে অংশ নিতে হবে, তাদেরকে সমাজের একটি মর্যাদাসম্পন্ন অংশ বানাতে হবে। এটা না করলে যুলুম করা হবে। সুবিচারের কোন কিছুই তো তাহলে আর তোমাদের মাঝে থাকলো না।

কোন কোন লোক এখানে ইংল্যান্ড, জার্মানী এবং ইউরোপের কোন দেশে বসবাস করে থাকে ; সমাজে বন্ধুদের মাঝে বরং জামাতের কর্মকর্তাগণের দৃষ্টিতেও বাহ্যিকভাবে বড়ই নিষ্ঠাবান ও পুণ্যবান হয়ে থাকে। কিন্তু স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে পাকিস্তানে ছেড়ে এসেছে আর জানাই নেই বেচারারা সেখানে কিভাবে দিন কাটাচ্ছে বা কোন কোন লোক এখানেও পরিবারকে ছেড়ে এসেছে। পরিবার কিভাবে দিন অতিবাহিত করছে সে খবরই রাখে না। যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন বলে দেয়, স্ত্রী ঝগড়াটে বা তার অমুক দোষ তমুক দোষ ইত্যাদি। এটা যদি মেনেও নেয়া হয় তাহলে এসব লোকের কথা ঠিক নয়। সেক্ষেত্রে সুবিচার ও ন্যায়বিচারের চাহিদা এই, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নাম নেয় তাদের প্রয়োজন পুরো করা তোমার কাজ। সন্তানাদির প্রয়োজন পুরো করা তো প্রত্যেক অবস্থায় পুরুষদেরই কাজ। পুরো করা কর্তব্য। স্ত্রীকে শাস্তি দিচ্ছো তো সন্তানদের শাস্তি দিচ্ছো কেন? তারাও দরজায় দরজায় ঠোকর খাচ্ছে। এমন পুরুষদের খোদাকে ভয় করা বাঞ্ছনীয়। আহমদী হওয়ার পর এসব কথ শোভা পাচ্ছে না। আর নেযামে জামাতের গোচরে আসার পর এমন সব কাজ সহ্য করার যোগ্য নয়। আমি এটা সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি, আমাদেরকে অবশ্যই সেই শিক্ষার ওপর আমল করতে হবে যা আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছে আর এ যুগে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

একটি হাদীস রয়েছে। হযররত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনদের মাঝে পরিপূর্ণ মু'মিন সেই ব্যক্তি যে তাদের

মাঝে উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আর তোমাদের মাঝে উত্তম লোক সে-ই, যে নিজ স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের অধিকারী (তিরমিযী, কিতাবুর রাযা'ই)।

আবার অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে। সুলায়মান বিন আমর বিন আহোস নিজ পিতা আমর বিন আহোস (রাঃ)-এর দোহাই দিয়ে একটি দীর্ঘ বর্ণনা উপস্থাপন করেন। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এটি বিদায় হজ্জের উপলক্ষে বর্ণনা করেছেন। এর একটি অংশ যা মহিলাদের সাথে সম্পর্ক রাখে তা নিম্নরূপ।

"শুন! তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের একটি অধিকার রয়েছে। এভাবে তোমাদের ওপরও তোমাদের স্ত্রীদের একটি অধিকার রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার এই ঃ তারা তোমাদের বিছানায় যেন সেসব লোকদেরকে না বসায় যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর না আর তারা সেসব লোকদেরকে তোমাদের ঘরে আসার অনুমতি না দেয় যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর না। আর তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের ওপর অধিকার ঃ তোমরা তাদের সাথে তাদের খাবার ব্যাপারে আর তাদের পরার ব্যাপারে অনুগ্রহের আচরণ কর (তিরমিযী,কিতাবুর রাযা'ই)।

বর্ণনা করা হয়েছে, ঘরের পরিবেশ সুবিচার ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে পরিষ্কার রাখ। অতএব স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই একে অপরের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের অধিকারের সুরক্ষা করতে হবে। মহিলাদের এ কথার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, তাদের ঘরে আগমনকারী মহিলারা বান্ধবীই হয়ে থাকে। এমন না হয় যাদের ঘরে আসাটা স্বামীরা পসন্দ করে না আর নিজেদের বন্ধুত্বও তাদের সাথে বৈধ বা অবৈধ না বানায়। স্বামী যদি তাদের ঘরে আসাটা পসন্দ না করে তাহলে তারা যেন না আসেন। হতে পারে কোন কোন ঘরের বিষয় স্বামীর জানা থাকে এ কারণে সে এসব লোকের ঘরে আসাটা পসন্দ করে না। এসব কথা এমনই, স্বামীর খুশি ও সন্তুষ্টির খাতিরে মহিলাদেরও খারাপ মনে করা উচিত নয়। আর স্বামী যা বলে তা মেনে নেয়া উচিত।

এ হাদীসে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা হয়েছে তা এই ঃ স্বামীদেরও এটা অবশ্য-কর্তব্য তারা যেন পরিবারের সকলের অধিকার/প্রাপ্য আদায় করে দেয়। সাংসারিক খরচাদি এবং তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাতো আমি আগেই করে দিয়েছি।

হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ) (পুরুষদের উদ্দেশ্যে) বলেন, মনে ব্যথা দেয়া বড়ই পাপ। মেয়েদের ভালবাসা খুবই নাজুক হয়ে থাকে। পিতামাতা যখন তাদেরকে স্বেচ্ছায় পৃথক ও অন্যদের হাতে ন্যস্ত করেন তখন লক্ষ্য করো, তাদের মনে কত আশাই সঞ্চারিত হয়ে থাকে। মানুষ এর অনুমান –আশিরুহুন্না বিল মা'রূফ (তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর– ৪ঃ ২০) আদেশ থেকে করতে পারে (আল্ বদর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬, ৮ জুলাই, ১৯০৪হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর তফসীরের বরাতে)।

আবার সন্তান-সন্ততির সাথে কোন কোন লোক অবিচার করে যায়। কাউকে কাউকে অনুচিত আদর দিয়ে বিনষ্ট করে দেয়। আর কারও কারও ওপর অপ্রয়োজনীয় কাঠিন্য সৃষ্টি করে বিনষ্ট করে দেয়। অতএব এসব শিশু বড় হয়ে কখনও কখনও নিজের বাপের সাথে ঘৃণাব্যঞ্জক আচরণ করতে থাকে।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এটা দূর করার জন্যে ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত নু'মান বিন বশীর বর্ণনা করেন। তার আব্বা তাকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে নিয়ে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি এ শিশুকে একটি গোলাম তোহ্ফা দিয়েছি। হুযূর (সঃ) বলেন, তুমি কি নিজের প্রত্যেক সন্তানকে এমন তোহ্ফা দিয়েছ। আমার আব্বা বলেন, না, হুযূর। তিনি (সঃ) বলেন, এ তোহ্ফা ফিরিয়ে নাও। আর এক বর্ণনায় এসেছে, হুযূর (সঃ) বলেন, আল্লাহ্তাআলাকে ভয় কর ও নিজের সন্তান-সন্ত নদের মাঝে সুবিচার কর এবং সাম্যের আচরণ কর। এরপর আমার পিতা সেই তোহ্ফা ফিরিয়ে নেন। অপর আর একটি বর্ণনায় আছে, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে এ তোহ্ফার সাক্ষী বানিও না। কেননা, আমি অবিচারের সাক্ষী হতে পারি না (বুখারী, কিতাবুল হুব্বাহ্)।

আবার জামাতের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। জামাতেও কখনও কখনও মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে কর্মকর্তাগণকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাদেরকেও একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যেন সুবিচারের সব চাহিদা পূরণ করা হয়। আবার রয়েছে কাযার ব্যবস্থাপনা। তাদের কাছে বিচারের জন্যে মামলা উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। তাদেরও সবসময় আল্লাহ্র আদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কখনও কারও পক্ষ থেকে সুবিচার ও ন্যায়বিচারের সাথে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় নি এ বলে অভিযোগ উত্থাপিত না হয়। কখনও কখনও কাযা বিভাগে নিষ্পত্তি ও মিটমাট করে দেয়ার চেষ্টা চালানোর জন্যে ব্যাপারটি দীর্ঘায়িত হয়ে থাকে। এতে কোন পক্ষ থেকে কাযা মীমাংসা করছে না বলে অভিযোগ সৃষ্টি হয়ে যায়। সবারই ধৈর্য ও উৎসাহের সাথে কাজ করা আবশ্যক। কাযার কর্মকর্তাগণকে অবশ্যই সুবিচারের সব চাহিদা পূরণ করে সিদ্ধান্ত করা উচিত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে এসেছে। রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেদিন পর্যন্ত সূর্য উদিত হয় সেদিন পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যে সদকা দেয়া উচিত। আর যে-ব্যক্তি লোকদের মাঝে ন্যায়বিচারের সাথে সিদ্ধান্ত দেন তখন সেটা তার জন্যে সদকা-স্বরূপ হয়ে থাকে (বুখারী, কিতাবুস্ সলাহ্)। অর্থাৎ যেসব লোককে সিদ্ধান্ত করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে তারা ন্যায়বিচার ও সুবিচারকে সামনে রেখে সিদ্ধান্ত করলে এটাও তাদের জন্যে একটি সদকা হবে। তাদের পক্ষ থেকে সদকা গণ্য হবে-এটা যেমন হৃদয়ের প্রশান্তির বিষয় তেমনই চিন্তার বিষয়ও বটে। চিন্তায় ফেলার বিষয়ও বটে। ভুল সিদ্ধান্তের জন্যে আবার শাস্তি না পেতে, জবাবদিহি করতে না হয়।

আরও একটি বর্ণনা আছে। আব্দুল্লাহ্ বিন মুওয়াহিব বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রাঃ) ইবনে উমর (রাঃ)-কে কাযী নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় বলেন, যাও, লোকদের মাঝে তাদের মামলা মোকদ্দমা মীমাংসা কর। তিনি বল্লেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে এ দায়িত্ব পালন থেকে ক্ষমা করতে পারেন না? এতে হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, তুমি কাযীর পদকে কেন অপসন্দ করছো? তোমার পিতাও তো সিদ্ধান্ত দিতেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এটা বলতে শুনেছি, মান কানা কাযীয়ান ফাকাযাবিল 'আদলি অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হয় তার ন্যায়বিচারের সাথে সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। আর এটাই সমীচীন যেন এ পদে থেকে কোন অভিযোগ সৃষ্টি না হয় এমন ভাবে বের হওয়া আবশ্যক। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশ শুনার পর এ পদের আকাঙ্ক্ষা করি না (তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম)।

তিনি (রাঃ) আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন এই ভেবে না জানি আবার এমন সিদ্ধান্ত হয়ে যায় যেজন্যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। আবার আর একটি বর্ণনায় আছে। হাসান বর্ণনা করেন, উবায়দুল্লাহ্ বিন যেয়াদ, মা'কুল বিন ইয়াসার-এর মৃত্যুশয্যায় তাকে দেখতে গেলে তিনি বলেন, আমি তোমাকে এমন হাদীস শুনাচ্ছি। আমি এটা রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি। আর আমি এখন জীবিত থাকব আমার যদি এ দৃঢ়বিশ্বাস থাকতো, তাহলে আমি এ হাদীস শুনাতাম না। আমি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন কোন বান্দা যার ওপর আল্লাহ্‌তাআলা কিছু লোকের দেখা-শুনা ফরয করে দিয়েছেন অথচ সে নিজের অধীনস্থদের দেখাশুনা করার সময় ন্যায়বিচার করে নি এমন অবস্থায় যদি সে মারা যায় তাহলে আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিবেন (সুনানে দারিমী, কিতাবুর রাক্বায়েক্ব)।

তাই বর্তমান যুগে আহমদীদের ওপর ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কেননা, আমরা যুগের ইমামকে চিনতে পেরেছি–এ কথার দাবিদার। আমরা তাঁর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। সেই ইমাম যাঁকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ন্যায়বিচারকও মীমাংসাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেখানে সেই ইমাম এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন সেখানে তাঁকে মান্যকারীদের কাছ থেকেও এটাই আশা করা যায়, তারাও ন্যায়বিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করবেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইবনে মরিয়ম অবশ্যই ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী হয়ে অবতীর্ণ হবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২ খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪ বৈরুতে মুদ্রিত)।

এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হিস সালামের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে।

আরও একটি বর্ণনায় এসেছে। হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন। তিনি (সঃ) বলেছেন, দুনিয়ার জীবন যদি একদিনও অবশিষ্ট থাকে তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা অবশ্যই আমার আহলে বায়ত থেকে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করবেন, যে দুনিয়াকে ন্যায়বিচারে ভরে দেবে যেভাবে তা আগে যুলুম অত্যাচারে ভরে ছিল (আবূ দাউদ, কিতাবুল ফিতন)।

অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আগমন খুবই জরুরী আর কিয়ামতের আগে তার আসা উচিত। কিয়ামতের আর এক দিন অবশিষ্ট থাকলেও তিনি আবির্ভূত হবেন। পর পর অন্য সব ঘটনা ঘটবে। আমরা সৌভাগ্যবান যারা ইমাম মাহদী (আঃ)-কে দেখেছি, চিনেছি এবং তাঁর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছি।

বর্তমান যুগে আহমদীদের ওপর ন্যায়বিচার ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কেননা, আমরা যুগের ইমামকে চিনতে পেরেছি–এ কথার দাবিদার। আমরা তাঁর বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি। সেই ইমাম যাঁকে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ন্যায়বিচারকও মীমাংসাকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেখানে সেই ইমাম এসব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন সেখানে তাঁকে মান্যকারীদের কাছ থেকেও এটাই আশা করা যায়, তারাও ন্যায়বিচারের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করবেন।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এখন মসীহে মাওউদের যুগ এসে গেছে। এখন খোদাতাআলা অবশ্যই আকাশ থেকে এমন সব উপকরণ সৃষ্টি করবেন যেভাবে পৃথিবী যুলুম ও অবৈধ রক্তপাতে পূর্ণ ছিল। এখন ন্যায়বিচার, নিরাপত্তা ও মৈত্রীতে ভরপুর হয়ে যাবে। আর কল্যাণমন্ডিত সেই ধনী ও বাদশাহ্ যে এথেকে কিছু অংশ পাবে (গভর্নমেন্ট আংরেজী আওর জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, ১৭ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯)।

পুনরায় তিনি বলেছেন, তোমাদের প্রতি খোদার আদেশ, তোমরা তাঁর সাথে ও তাঁর সৃষ্টির সাথে ন্যায়বিচারপূর্ণ আচরণ কর। অর্থাৎ হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদ আদায় কর। এর চেয়ে অধিক হলে কেবল ন্যায়বিচারই নয় বরং অনুগ্রহ কর। অর্থাৎ অবশ্য-কর্তব্য করার পরও এমন আচার-আচরণের সাথে খোদার ইবাদত কর যেন তোমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। লোকদের সাথে প্রাপ্য অধিকার থেকে অধিক উত্তম আচরণ কর। আর যদি এথেকে বেশি হতে পারে তখন নিষ্পাপ ও অভাবহীন খোদার ইবাদত ও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেবা কর যেভাবে কেউ নৈকট্যের আবেগে করে থাকে (শাহানায়ে হক্, রূহানী খাযায়েন, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৬২)।

অন্য এক স্থানে তিনি (আঃ) বলেছেন, যেভাবে মা তার নিজ সন্তানের সাথে করেন তেমনি আচরণ কর।

আবার তিনি (আঃ) বলেন, মোটকথা মানবমন্ডলীর সাথে স্নেহ-মমতার সহানুভূতি দেখানো খুব বড় ইবাদত। আর আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে এটা একটা শক্তিশালী মাধ্যম। কিন্তু আমি দেখি এ দিক থেকে খুবই দুর্বলতা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। অনেক তুচ্ছ মনে করা হয়। তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে। তাদেরকে দেখাশুনা করা ও কোন দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করাতো খুবই ভাল কথা। যেসব লোক গরীবদের সাথে অতি উত্তম আচরণ করে না বরং তাদেরকে হেয় মনে করে, আমার ভয় হয়, তারা না আবার সেই দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়ে যায়। আল্লাহ্‌তাআলা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন শোকরগুযারী এটাই তাঁর সৃষ্টির সাথে তাদের অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করা এবং সেই খোদা কর্তৃক প্রদত্ত অনুগ্রহ নিয়ে গর্ব না করা আর হিংস্র প্রাণীর মত গরীবদেরকে দলিত-মথিত না করা (মলফূযাত, ৪ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৩৯, নতুন সংস্করণ)।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করুন যেন আমরা হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী এ পৃথিবীতে শান্তি, মৈত্রী ও ন্যায়বিচারের পরিবেশ সৃষ্টিকারীতে, প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত হই। কেননা, ভবিষ্যতে পৃথিবীর যে অবস্থা হতে যাচ্ছে এতে আহমদীদের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে আর এটা পালন করতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ১৯-২৫, মার্চ ২০০৪ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

অনুবাদ– মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

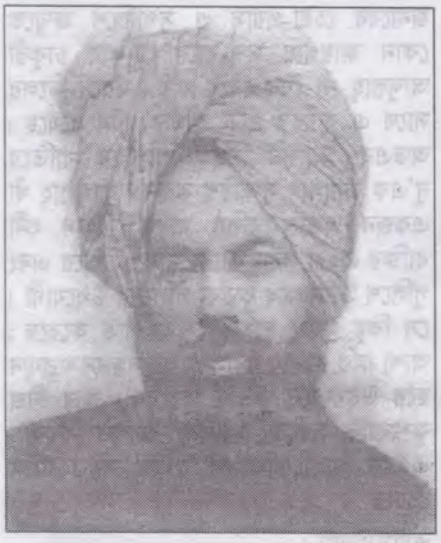

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি-পত্র

(মকতুবাতে আহ্মদীয়া, ৫ম খন্ড)

সংকলক– হযরত ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ)

(ষষ্ঠ কিস্তি)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) এর নামে

পত্র নং ২৬

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজ পাঁচশ' টাকার নোট রেজিস্ট্রী যোগে পৌঁছেছে। এ যাবৎ আ'লী জনাবের পক্ষ থেকে পাচশ' ষাট টাকা পৌঁছুল। এই প্রয়োজনের সময়ে যে পরিমাণ আপনার পক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে এতে আমি যে আরাম ও স্বস্তি বোধ করেছি তা আমার কল্পনাতীত। আল্লাহ্‌তাআলা ইহকাল ও পরকালে আপনাকে নিত্যনূতন সুখ ও আনন্দ দান করুন এবং আপনার ওপর বিশেষ রহমতের বারিবর্ষণ করুন।

'তাকযীব বারাহীন' পুস্তক খন্ডনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ আমি আপনাকে একটি জরুরী বিষয় সম্বন্ধে অবগত করছি, সম্প্রতি লেখরাম নামে এক ব্যক্তি আমার প্রণিত গ্রন্থ 'বারাহীন (আহমদীয়া)'-এর খন্ডনকল্পে অনেক কিছু আবোল-তাবোল বকেছে। আর তার এ পুস্তকের নাম 'তাকযীব বারাহীন আহমদীয়া' রেখেছে। এ ব্যক্তি আসলেই নির্বোধ ও নিরেট অজ্ঞ এবং অশ্রাব্য ভাষা ছাড়া তার কাছে আর কিছু নেই। কিন্তু জানা গেছে , এ পুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক তাকে সাহায্য করেছে। এ পুস্তকে দু'রকম বাক্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়। যে সব গালি গালাজ, বিদ্রুপ ও উপহাসে ভরা, শব্দে শব্দে (অন্যের) অপমান এবং ভাঙ্গাচুরা বাক্য ও কুরুচিপূর্ণ ভাষ্য রয়েছে সে সব ছত্র হচ্ছে লেখরামের। আর যে সব ছত্র কিছুটা শালিনতা ও সভ্যতার পরিচয় বহন করে এবং জ্ঞানগত বিষয় সম্পর্কিত, সেগুলো অন্য কোন শিক্ষিত ব্যক্তির। মোট কথা, এই ব্যক্তি (লখরাম) শিক্ষিত হিন্দুদের মিনতি করে এবং বহু পুস্তকের অসততামূলকভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখিত পুস্তকটি রচনা করেছে। এ পুস্তক রচনায় হিন্দুদের মাঝে অনেক জোশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিশ্চয় কাশ্মীরেও এ পুস্তক পৌঁছে থাকবে। কেননা আমি শুনেছি, কাশ্মীর রাজ্যের কর্মচারী লালা লক্ষণ দাস সাহেব এ পুস্তক ছাপার জন্য তিনশ' টাকা দিয়েছেন। সম্ভবত এ কথা সত্য, কি মিথ্যা কিন্তু এই মিথ্যার আকর এ পুস্তকটির বিহিত প্রতিকার অতি দ্রুত হওয়া অত্যাবশ্যক। 'সিরাজে-মুনীর' পুস্তক প্রণয়নের যে জরুরী কাজ এখনও এ অধমের হাতে রয়েছে এর দরুন অধমের একেবারে কোন ফুরসত নেই। আর আমি অতিশয়োক্তি স্বরূপ বলছি না এবং আপনার প্রশংসাচ্ছলেও বলছি না, বরং শক্তিশালী দৃঢ়বিশ্বাসের ধারায় খোদাতাআলা আমার হৃদয়ে একথা প্রোথিত করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলা নিজ ধর্মের সাহায্যের জন্য আপনার হৃদয়ে যে পরিমাণ জোশ দিয়েছেন এবং আমার সহানুভূতিতে আপনাকে অনুপ্রাণিত ও প্রস্তুত করেছেন –এসব গুণাবলীতে গুণান্বিত অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না তাই আমি আপনাকে এ কষ্টও দিতে চাই যে, আপনি বইটি অদ্যাপান্ত দেখুন এবং এ ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যতগুলো আপত্তি উত্থাপন করেছে সে সবগুলো বইটির পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখে নিন। তারপর সেগুলোর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা যে সব যুক্তিযুক্ত উত্তর আপনার হৃদয়ে উদ্রেক করেন সে সবগুলো আলাদা আলাদা লিখে আমার নিকট পাঠিয়ে দিন। আর যা বিশেষ কিছু আমার দায়িত্বে হবে , সে মতে আমি ফুরসত পেয়ে এ বইয়ের উত্তর লিখবো। মোটকথা, এ কাজটি অত্যন্ত জরুরী এবং আমি অত্যন্ত তাগিদের সাথে আপনার খিদমতে নিবেদন করছি, আপনি পুরোপুরি সাধ্য-সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাণপনে এদিকে মনোযোগী হোন। আর যেভাবে আর্থিক কাজে আপনি পুরোপুরি সাহায্য করেছেন, সেভাবেই খোদাপ্রদত্ত শক্তি ও ক্ষমতানুযায়ীও এ কাজে সাহায্য করুন। কেননা একাজটি প্রথমোক্ত কাজের চেয়ে কম (গুরুত্ববহ) নয়।

আজ আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের মোকাবেলায় একজোট হয়ে ইসলামের ওপর আঘাত হানতে প্রাণপন চেষ্টা চলাচ্ছে। আমার মতে আজ যে ব্যক্তি ময়দানে অবতীর্ণ হয় এবং ইসলামের কলেমাকে গৌরবান্বিত করার লক্ষ্যে সচেতন ও সচেষ্ট হয় সে ব্যক্তি (প্রকৃতপক্ষে) পয়গাম্বরদের কাজ করে থাকে। খুব শীঘ্র আমাকে অবগত করুন। খোদাতাআলা আপনার সাথী ও সহায়ক হোন। আপনি যদি আমাকে লেখেন, উল্লেখিত পুস্তকের এক কপি কিনে আমি আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দেব। ওয়াস্‌সালাম।

বিনীত

গোলাম আহমদ

কাদিয়ান, ২৬ জুলাই ১৮৮৭ইং

পত্র নং ২৭

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সালামাহুতাআলা)

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেলাম। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে সকল সৎ লক্ষ্যে ও মহৎ উদ্দেশ্যাবলীতে কৃতকার্য করুন; আমীন সুম্মা আমীন। লেখরাম পেশাওরীর পুস্তক আপনার খিদমতে পাঠানো হয়েছে। আশা করি, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে এর রফা-দফা ও খন্ডনের কাজ সমাধা করবেন। যাতে অসচ্চেতা বিরুদ্ধবাদীর দ্রুত লাঞ্ছনা প্রকাশিত হয়। এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয় না এমন দিন খুব কমই যায়। চতুর্দিকে সমুদ্রের ন্যায় পানি দাঁড়িয়ে আছে। এ কারণে এখনও কাগজ আনানো হয় নি। দশ-পনের দিন পর যখন এই ব্যাপক বৃষ্টিপাতের দিন পেরিয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহুল ক্বাদির

কাগজ আনিয়ে (ছাপার) কাজ শুরু করা হবে।

বিয়ের এক প্রস্তাব সম্পর্কে জনাব আমার কাছে জানতে চেয়েছেন। এমন ব্যক্তির মেয়ের সাথে আপনার বিয়েতে আমার মন কখনও সায় দেয় না। যদিও এ বিষয়ে দোয়া করেছি কিন্তু আমার মন এ থেকে দূরে থাকারই ফতওয়া দিয়েছে। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু সকল বিষয়ে সর্বসক্ষম। যেমন তিনি বলেন, "ওয়ামা নান্সাখ্ মিন আয়াতিন আও নুনসিহা না'তি বি-খাইরিম মিনহা আও মিসলাহা আলাম তা'লাম আন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" (-আমরা কোন আয়াত (নিদর্শন) রহিত বা বিস্মৃত করলে অবশ্যই এর চেয়ে উত্তম অথবা সে রকমই আরেকটি উপস্থিত করি।"-অনুবাদক)

আপনার কয়েকটি চিঠিতে যে ব্রাহ্মণপুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন, আমি তার জন্যও ইনশাআল্লাহ্ দোয়া করবো। তার ভিতর যদি সৌভাগ্যের কিছু অংশ (উপাদান) থাকে তাহলে সে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করবে।আর সে যদি এ শ্রেণীভুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে কোন উপায়ন্তর নেই।

আশা করি লেখরামের বিষয়ে জনাব খুব শীঘ্র পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করবেন। প্রথমত তার উত্থাপিত সকল আপত্তি বেছে নিয়ে আলাদা একটি কাগজে লিখে নিন। তারপর সেগুলোর সংক্ষিপ্ত, যুক্তিযুক্ত ও দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেয়া হোক। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনার ওপর সর্বদা নিজ কৃপা ও রহমত ও সাহায্য দিয়ে ছায়াপাত করুন এবং আপনার সবিশেষ সহায়ক ও সমর্থক হোন।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ৫ আগষ্ট ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য ঃ হযরতের (আঃ) চিঠিগুলোতে যে হিন্দু ছেলেটির উল্লেখ এসেছে তিনি হলেন শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, এডভোকেট, আলীগড়। (ছোট থাকতে) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ)-এর কাছে থাকতেন কাশ্মীর রাজ্যের বড় বড় হিন্দু কর্মকর্তা এর বিরোধী ছিলেন, তারা সে ছেলেটিকে হযরত মৌলবী সাহেবের কাছ থেকে বের করার জন্য চেষ্টা-তদ্বীর করতে থাকেন কিন্তু এতে তারা সফল হতে পারেন নি। একবার সে ছেলেটি মুসলমান হবার পর মুরতাদ হবারও উপক্রম হয়, কিন্তু খোদাতাআলা তাকে রক্ষা করেন। আর এখন সে আলীগড়ের একজন সফল উকিল এবং আলীগড় আন্দোলনের একজন উদ্যমশীল সমর্থক এবং এর কর্মীবৃন্দের অন্যতম। বিশেষত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অতি প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। (ইরফানী)

পত্র নং ২৮

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম

শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা মৌলবী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব (সাল্লামাহুতাআলা)

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

বহু দিন হয়ে গেল, আপনার কুশলাদি সম্পর্কে অনবিহিত রয়েছি। আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু আপনাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখুন। এদিকে এত প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে যে, বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিরা বলেন, এমন ভারি বর্ষণ তারা তাদের জীবনকালে কখনও দেখেন নি। এ কারণেই বই-পুস্তক ছাপার কাজ এখনও শুরু করা যায় নি। কেননা, একে তো কাগজ আনাবার ক্ষেত্রে বড়ই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত প্রতিদিনকার বৃষ্টিপাতে উত্তম ছাপার কাজে অনেক ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়। অতএব সুনিশ্চিতভাবে বিশ-বাইশ দিন পর বৃষ্টিপাত কিছু থামলে দিল্লি থেকে কাগজ আনানো হবে। তখনই আল্লাহ্তাআলার ফযলে পুস্তক ছাপার কাজ শুরু হবে। এখন আমি একটি কাজের জন্য আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি। তা এই যে, একজন অতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি যার হৃদয় ইখ্লাস ও নিষ্ঠায় ভরপুর, তার নাম ফতেহ্ খান। সে এমন সব অনিবার্য বিপদাবলীর কারণে, যা সচরাচর মানুষের জন্যেই অবস্থানুযায়ী নিয়তির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে, অনেক ঋণভারে দায়বদ্ধ হয়ে আছে। আর তা সত্ত্বেও তার অন্তঃকরণ কিছুটা এমনই ছাঁচে গঠিত যে, জাগতিক দুঃখ-বেদনার চেয়ে ধর্মীয় দুঃখ-বেদনা তার ওপর অনেক বেশি ছেয়ে আছে। কিন্তু আমি যেহেতু তার অভ্যন্তরীণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অবহিত, সেজন্য তার এ অবস্থায় আমার খুব দয়া হয়। আর আব্দুল্লাহ্ খাঁ নামে তার ছোট ভাই আছে। সে নেক স্বভাবের যুবক-বিশ-বাইশ বছর বয়সের একজন উপযুক্ত মানুষ। ফতেহ্ খাঁর ওপরে যেহেতু ধর্মের প্রতি সহানুভূতি ও দুঃখবোধ এত বেশি ছেয়ে পড়েছে যে, সে কঠোর পরিশ্রম সহকারে জাগতিক আয়-উপার্জনে তৎপর হওয়ার উপযোগী নয়। কিন্তু তার ভাই এর উপযোগী। অতএব আমি চাই, জনাবের চেষ্টা-প্রয়াস ও সুপারিশে জম্মুতে কোন জায়গায় দশ-বারো টাকার চাকুরী আব্দুল্লাহ্ খাঁ যেন পেয়ে যায়। দরদে-দিলের সাথে এ ব্যক্তির প্রতি আমার ধ্যান রয়েছে। অতএব, আপনি নিছক আল্লাহ্র খাতিরে দু'এক জায়গায় সুপারিশ করুন। আব্দুল্লাহ্ খাঁ একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ মানুষ। কোন ধনী ব্যক্তির প্রহরী দলে কাজে লাগতে পারে এবং পুলিশে উত্তমভাবে কর্তব্য পালনের উপযোগী। সে কিছু ফার্সি ভাষাও শিক্ষা লাভ করেছে। আশা করি, জনাব যথাসাধ্য অনুসন্ধানে যত্নবান হয়ে উত্তরদানে কৃতার্থ করবেন। আর নিজ কুশালাদি সম্বন্ধে যথাশীঘ্র অবগত করুন। এখানে আল্লাহ্তাআলার ফযলে সর্বত মঙ্গল রয়েছে।

ওয়াস্সালাম।

বিনীত
গোলাম আহমদ
কাদিয়ান, ১৭ আগষ্ট ১৮৮৭ইং

সংকলকের মন্তব্য ঃ ফতেহ্ খাঁ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে খাদেম (সেবক) হিসাবে ছিলেন। প্রায় চার-পাঁচ বছর কাল যাবৎ এখানে থাকেন। তিনি 'টান্ডা' সংলগ্ন রিসালপুরের অধিবাসী। জাতে আফগান (পাঠান)। হযরত আকদাস (আঃ)-এর খিদমতে কেবল আন্তরিক নিষ্ঠায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে থাকতেন। তার ভাই আব্দুল্লাহ্ খাঁও এখানে দেড় বছরকাল ছিলেন। তার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উল্লেখিত সুপারিশ করেছেন। যদিও তারা কেবল নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সূত্রে থাকতেন। তাদের জন্য কোন বেতন নির্ধারিত ছিল না। কিন্তু মির্যা মোহাম্মদ ইসমাঈলকে হযরত আকদাস আদেশ দিতেন, 'তাদের কাপড় ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দাও।' নগদ টাকাকড়িও বিভিন্ন সময় দান করতেন। যেহেতু নগদ টাকা-পয়সা এবং হিসাবাদি মির্যা ইসমাঈল সাহেবের দায়িত্বে ছিল সেজন্য তাঁকেই নির্দেশ দিতেন। এথেকে জানা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর খাদেমদের প্রয়োজনাদির ব্যাপারে কত সচেতন ও সংবেদনশীল ছিলেন। এ পত্রটি এ বিষয়ে অধিকতর আলোকপাত করে, তিনি (আঃ) কত আন্তরিকভাবে হযরত হেকীম মৌলবী নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর কাছে তার জন্য সুপারিশ করেছেন। (ইরফানী)

(চলবে)

অনুবাদ- মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আহমদীয়াত ইয়ানী হাকীকী ইসলাম

(আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম)

হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)

(১৬তম কিস্তি)

আমি বলেছি, প্রকৃত জ্ঞান হলো সেই বিশেষ অনুভূতি যা মানুষের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, আর রূহানী দৃষ্টির সেই প্রগতি যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে খোদাতাআলার গুণাবলীতে দেখতে পায়। যেভাবে প্রত্যেক জিনিসের কিছু প্রভাব রয়েছে তেমনি খোদাতাআলার সাক্ষাতেরও কিছু লক্ষণ ও প্রভাব রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর সম্পর্ককে অনুভব করে। অন্যরাও এই সম্পর্ককে অনুভব করে; কেননা এ বিষয়টি স্পষ্ট, যখন কোন জিনিস অন্য কোন জিনিসের নিকটবর্তী হয়, আর যদি সেই জিনিসটি নিজের ভিতর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রাখে তাহলে এর প্রভাব অন্যটির উপরও পড়ে। যেমন আগুনের পাশে বসলে মানুষ গরম অনুভব করে, বরফের কাছে বসলে ঠান্ডা অনুভব করে, সুগন্ধযুক্ত জিনিস ছুলে তার কাপড় থেকে সুগন্ধ ছড়াতে থাকে অথবা বক্তার নিকটবর্তী হলে বক্তার কথার আওয়াজের সৃষ্ট তরঙ্গ তার কানের পর্দায় ধাক্কা লাগতে শুরু করে, আর বক্তার জ্ঞান হতে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি খোদার সাক্ষাত লাভ করে তাহলে তার মাঝে এর কোন না কোন প্রভাব অবশ্যই পাওয়া যাবে। যা প্রমাণ করবে, সে প্রকৃত পক্ষে খোদাতাআলার নৈকট্য অর্জন করেছে। নইলে যদি মুখের দাবীর বেশি কিছু না থাকে তাহলে ধোকাবাজ, প্রতারক আর নেক ও খোদাভক্তের মধ্যে পার্থক্য কি থাকবে? আর সাক্ষাতের মর্যাদা লাভকারীকে দেখে কি লাভ হবে? ইসলাম সাক্ষাতের তিনটি স্তরের কথা বলেছে যেগুলো বিশ্বাসকে বাড়ানোর প্রধান মাধ্যম।

১) দোয়ার কবুলিয়্যত

২) খোদার সাথে বাক্যালাপ

৩) খোদাতাআলার গুণাবলীকে বান্দা নিজের মাঝে ধারণ করে নেয়।

প্রথম ধাপ অর্থাৎ দোয়া কবুলিয়্যতের উপর ইসলামের দাবী হলো, আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে নিজ সত্তার সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করার নিমিত্তে নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান দানের জন্য এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য দোয়ার দরজা খুলেছেন। অর্থাৎ যদি কেউ খোদাতাআলার কাছে দোয়া করে তাহলে খোদাতাআলা তা কবুল করেন। কিন্তু শর্ত হলো দোয়া সেই পদ্ধতিতে, সেভাবে করতে হবে যেভাবে করা উচিত। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন আম্মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া আনযালালাকুম মিনাস সামায়ি মাআন ফাআমবাতনা বিহি হাদায়িকা যাতা বাহযাতিন সাকানালাকুম আনতুমবিতু সাজারাহা আইলাহুম মা আল্লাহি বালহুম কাওমুন ইয়াহ্‌দিলুন (নমল-৬১)।

আল্লাহ্‌তাআলা মানুষকে নিজ সত্তার সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করার নিমিত্তে নিজ অস্তিত্বের জ্ঞান দানের জন্য এবং নিজের দিকে আকর্ষণ করার জন্য দোয়ার দরজা খুলেছেন। অর্থাৎ যদি কেউ খোদাতাআলার কাছে দোয়া করে তাহলে খোদাতাআলা তা কবুল করেন।

এই ধাপকে আল্লাহ্‌তাআলা সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন অর্থাৎ যে ধর্মেরই লোক হোক যখন সে খুবই ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করে তিনি শুনেন। আর এভাবে তিনি সুযোগ করে দেন যেন সে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁর সম্পর্ককে অনুভব করে আর যেন সন্দেহ ও দ্বিধা থেকে মুক্তি পায়। এতে কোন সন্দেহ নেই, খোদাতাআলার দিকে মনোনিবেশ ঘটানোর জন্য প্রত্যেক ধরনের বা স্তরের লোকের কোন না কোন তত্ত্বজ্ঞান পাওয়া উচিত। কেননা মানুষ কেবল তখনই মনযোগ বা দৃষ্টি দেয় যখন তার হৃদয়ে কোন জিনিসের গুরুত্ব সৃষ্টি হয়। আমি এই যে মর্যাদার উল্লেখ করলাম তা সকল ধর্মের লোকদের জন্য উন্মুক্ত। প্রত্যেক ধর্মের লোক খোদাতাআলার কাছে দোয়া করে দেখতে পারে, সে অবশ্যই উপকার পাবে আর তারা বুঝবে, দোয়ার মাধ্যমে এমন অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় যার জন্য তারা পূর্বে কষ্ট পেত। কিন্তু এই ধাপ খুবই নিম্ন স্তরের কেননা সর্বদা মানুষের হৃদয়ে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, 'সম্ভবতঃ দোয়ার পর যে কাজ হয়ে গেছে তা এমনিতেই হয়ে যাবার ছিল এবং সে বিপদ টলে গেছে তা হয়ত এমনিই টলে যেত' কেননা কখনও কখনও আমরা দেখি যে, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, অনেক হওয়ার মত কাজ থেমে যায় এবং কঠিন কাজও হয়ে যায় আর এর জন্য কোন দোয়াও করা হয় না, এমন কি এ ঘটনা যে ব্যক্তির সাথে হচ্ছে সে দোয়াতে বিশ্বাসীও নয়।

এ ছাড়াও এ ধাপে আরেকটি বিষয় রয়েছে, আর তা হলো এটি কিছু প্রকৃতিগত নিয়মের সাদৃশ্য অর্থাৎ মেসমিরিজম ও হিপনোটিজম এ দুটি প্রাকৃতিক মাধ্যম দ্বারা আমরা দেখি, অনেক রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যায় এবং অনেক দুঃখ কষ্ট চলে যায়। তাই সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, দোয়া এ ধরনেরই কিছু হবে। হয়তবা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য আসে না বরং শুধু সম্মিলিত দৃষ্টির কারণে কিছু ফলাফল প্রকাশ পেয়ে যায়। যদিও এই ধাপের দোয়ার ব্যাপারে এ দ্বিধা দন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু তবু এটি বিশ্বাসের এক প্রকার মাধ্যম। আর লোক এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

এই যে আমি বলেছি, দোয়ার ব্যাপারে এ দ্বিধার সৃষ্টি হতে পারে আমার এটি বলার উদ্দেশ্য হলো দোয়ার আরেকটি ধাপও আছে যা একদম বাস্তব কিন্তু তা তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্তী ভাগের অন্তর্ভুক্ত। এর উল্লেখ আমি এর সাথেই করব।

জ্ঞানের দ্বিতীয় ধাপ হলো খোদাতাআলার সাথে বাক্যালাপ। ইসলাম এই ধাপের ব্যাপারে

বিশেষ জোর দেয়। অন্যান্য ধর্ম সাধারণভাবে এই দরজাকে বন্ধ বলে মনে করে। কিন্তু কোন বিবেক মেনে নিতে পারে না যে, সেই খোদা যিনি বান্দাকে নিজ অস্তিত্বে বিশ্বাসী করার জন্য পূর্বে কথা বলতেন এখন তিনি কথা বলা একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। খোদাতাআলার সিফত তো সর্বদার জন্য স্থায়ী। তিনি সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি হতে পবিত্র। তাহলে এই নিরবতা যা শত বছর থেকে শুরু হয়ে এখন হাজার পর্যন্ত পৌঁছতে যাচ্ছে এই নিরবতা কেন? যদি তিনি কথা না-ই কী বলেন তাহলে কিভাবে বুঝা যাবে যে তিনি শুনেন? আর কিভাবে বুঝা যাবে যে তার অন্যান্য সিফত ঠিক আছে? যদি খোদাতাআলার কথা বলা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কারো কি প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, এখন তিনি দেখেনও না তাঁর জ্ঞানও লোপ পাচ্ছে, তিনি কোন হিফাজত করতে পারেন না, এমনকি দুনিয়ার কর্মকান্ড নিজে নিজেই চলছে, এটা মনে করলে দোষের কি? যদি তাঁর বাকি অন্যান্য সিফত যেভাবেই কাজ করছে যেভাবে পূর্বেই করত তাহলে তার কথা বলার সিলসিলা কেন বন্ধ হয়ে গেল? তিনি অদৃশ্য, আর তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য তাঁর দর্শন তো সম্ভবই না। এজন্য বাক্যালাপই ছিল যা তার অস্তিত্বের জ্ঞান দিত। এখন এ রাস্তাও যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস আনয়নের আর কোন রাস্তা খুলা আছে কি?

হে ভাই ও বোনেরা! ইসলাম বলে খোদার কথা বলা বন্ধ হয়েছে এ ধারণা ঠিক নয়। তিনি এখনও তেমনিভাবে কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন। তিনি তাঁর বান্দাকে আজও তেমনিভাবে স্মরণ করেন যেভাবে পূর্বে করতেন। এমনকি তিনি তাঁর রাস্তায় পরিচালিত করার হেদায়েত দেয়ার জন্য কথা বলার সিলসিলা দোয়ার মত প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আর যারা খোদার দীন হতে অনেক দূরে এমন লোকদের উপরন্ত কখনও কখনও ইলহাম হয় যেন নেক ব্যক্তিদের বাক্যালাপে তারা সন্দেহ না করে বরং তাদের সত্যতার সাক্ষ্যি হয়।

পবিত্র কুরআন করীম বলে, ইন্নাল্লাযীনা কালূ ... তাদ্দায়ুন (হা মিম সাজদা আয়াত ঃ ৩১-৩২)।

অর্থাৎ মু'মিনদের আসল চাওয়া, খোদার সাক্ষাত অতি উত্তম ভাবে পূর্ণ হবে।

এই আয়াত হতে বুঝা যায়, ইসলাম খোদার বাক্যালাপের দরজা উন্মুক্ত মনে করে। এসবের ওয়াদাও করে। যার সাথে সরাসরি খোদাতাআলা অথবা ফেরেশ্‌তা বাক্যালাপ করবে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও ঈমান কেমন বৃদ্ধি পাবে, আর তার আত্মা কেমন তাকওয়া লাভ করবে তা একেবারে স্পষ্ট। কেননা খোদার কথা শ্রবণ করাও এক প্রকার দর্শন। যদি জঙ্গলে কোন বন্ধু আলাদা হয়ে যায় আর আমি উমুক জায়গায় আছি বলে যদি সে আমাদেরকে আওয়াজ দেয় তাহলে আমাদের ভয় সেভাবেই দূর হয়ে যাবে তাকে দেখলে

ইসলাম বলে খোদার কথা বলা বন্ধ হয়েছে এ ধারণা ঠিক নয়। তিনি এখনও তেমনিভাবে কথা বলেন যেভাবে পূর্বে কথা বলতেন। তিনি তাঁর বান্দাকে আজও তেমনিভাবে স্মরণ করেন যেভাবে পূর্বে করতেন।

যেভাবে দূর হতো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌তাআলা যার সাথে কথা বলেন তার হৃদয়ে দেখা জিনিসের মতই খোদাতালার উপর বিশ্বাস হওয়া উচিত।

ইসলাম এই দাবীই করে না বরং ১৩০০ বছর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে এমন মানুষের সৃষ্টি হয়ে আসছে যাদের সাথে খোদা কথা বলেছেন। আর এ বিষয়টি পর্যায়ক্রমে হয়েই আসছে।

সুতরাং এ ব্যাপারে কোন ধরনের সন্দেহ করা মূলতঃ ব্যর্থতার দরজা উন্মুক্ত করা। এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর প্রতি খোদাতাআলার বাক্যালাপ হয়েছে। আর তাঁর (আঃ) কুওওতে কুদসিয়ার প্রভাবে এ জামাতে হাজার হাজার লোক খোদার কথা শুনার সৌভাগ্য পেয়েছে। এমনকি আমি মনে করি ৫০ জন আহমদী এমন হয়ে যায় কোন না কোন ভাবে খোদাতাআলার কথা শুনে থাকবে। আর এর মাধ্যমে তাদের ঈমান ও বিশ্বাসে জোর সৃষ্টি হয়ে থাকবে।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে আর তাহলো খোদাতাআলার কথা বলার অর্থ সেই ব্যাখ্যা নয় যা বর্তমানে লোকেরা মনে করে থাকে অর্থাৎ যদি কারো মনে কোন নেক চিন্তার উদ্দেগ হয় তাহলে সে একে ইলহামে এলাহী বলে। বরং কিছু লোক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে এমন বাড়িয়ে বলে, তারা মনে করে খোদাতাআলার বাক্যালাপ কখনও ভাষায় নাযেল হয় না বরং নবীদের মনের চিন্তাধারার নামই ইলাহী বাক্যালাপ রাখা হয়েছে। ইসলাম কখনও এমন বলে না বরং ইসলাম আমাদেরকে বলে ইলহামে ইলাহী ভাষায় নাযেল হয় আর বান্দার সাথে খোদার তেমনিভাবে বাক্যালাপ হয় যেভাবে মানুষ পরস্পর একে অপরের সাথে কথা বলে, আর তেমনি আওয়াজ হয় যেমন আওয়াজ মানুষের কথা বলায় হয়। মানুষ এই বাক্যালাপ সেভাবেই শুনে যেভাবে দৈনন্দিন জীবনের কথা শুনে। এর মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই ইলহামী আওয়াজ খুবই মধুর হয় আর এর মাঝে একপ্রকার প্রতাপ থাকে। আর এতে প্রতাপ থাকা স্বত্তেও এর ভিতর এমন মিষ্টতা ও শান্তি থাকে যে মানুষের তন্দ্রাভাবের সৃষ্টি হয় আর মনে করতে থাকে যে তাকে উপরের দিকে টানা হয়েছে আর কোন শক্তিধর সত্তা তার উপর প্রবল হয়েছে তখন কোন সূক্ষ্ম কথা তার কানে প্রবেশ করানো হয় বা যে শুনে অথবা তার মুখে নাযেল করা হয় যা সে পড়ে অথবা লিখিত আকারে তার সামনে উপস্থাপন করা হয় যা সে মুখস্ত করে ফেলে। কিন্তু এ পুরো সময়টুকুতে তার উপর তন্দ্রাভাব প্রবল থাকে যেন এর প্রমাণ থাকে যে এসব তার ভ্রান্ত চিন্তাধারা নয় বরং এক শক্তিধরের পক্ষ থেকে এসব কিছু হচ্ছে।

(চলবে)

মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান
মুবাশ্বের মুরব্বী

মানবতার সর্বোত্তম আদর্শ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)

মূল ঃ হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(দ্বিতীয় কিস্তি)

খোদাতাআলার সঙ্গে মহব্বত এবং এবাদত

হযরত রসূল করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের প্রতি তাকালে দেখা যায়, সমস্ত জীবন ছিল ইশকে ইলাহীতে (ঐশী-প্রেম) নিমজ্জিত। জামাতী গুরু দায়িত্বাবলী সম্পাদন করার পরও তিনি দিনরাত এবাদতের মধ্যে মশগুল থাকতেন। অর্ধেক রাত কেটে গেলে পরই তিনি খোদাতাআলার এবাদতের জন্য খাড়া হয়ে যেতেন এবং ভোর পর্যন্ত এবাদত করতেন। এমনকি, কোন কোন সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পা ফুলে যেতো, এবং তাঁর সেই অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি লোকদের দয়া হতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, একবার এ রকম এক অবস্থায় আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আপনিতো খোদাতাআলার সান্নিধ্য ও সন্ধান পেয়েই গেছেন, আপনি আপনার প্রাণের ওপরে কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন? জবাবে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, হে আয়েশা! আমার কি উচিত নয় তাঁর ভালবাসার জন্য তাঁর শোকরগুজারি করা? এ কথা যখন সত্য যে, খোদাতাআলার নেকট্য আমি লাভ করেছি, এবং খোদাতাআলা আপন কৃপাবশে তাঁর নৈকট্য আমাকে দান করেছেন, তখন এটা কি আমার কর্তব্য নয় যে আমি যতটা পারি তাঁর শুক্‌রিয়া আদায় করি? (তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি?)। কেননা, কৃতজ্ঞতা তো কৃপার পরিবর্তেই জ্ঞাপন করা হয়। (বুখারী)

তিনি (সঃ) কোন বড় কাজ খোদার প্রত্যক্ষ অনুমতি ছাড়া করতেন না। তাই তাঁর সম্পর্কে লিখিত হয়েছে যে, মক্কার লোকদের দুর্বিসহ যুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি ততদিন পর্যন্ত মক্কা ছেড়ে চলে আসেন নি, যতদিন পর্যন্ত খোদাতাআলার তরফ থেকে তাঁর প্রতি ওহী হয়নি, এবং ওহীর মাধ্যমে তাঁকে মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুকুম দেওয়া হয়নি। মক্কাবাসীদের অত্যাচারের তীব্রতা ও কঠোরতা দেখে তিনি যখন সাহাবাদেরকে (রাঃ) আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, এবং তাঁরা যখন তাঁর কাছে এই আশা ও ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, তিনিও যদি তাঁদের সঙ্গে যেতেন ; তখন তিনি বললেন, আমি তো এখনও খোদাতাআলার অনুমতি পাইনি। অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টের সময়ে মানুষ যখন আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসে, এবং সবাই মিলে এক সাথে থাকে, তখনই তিনি তাঁর জামাতের লোকদেরকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করে যাওয়ার উপদেশ দিলেন এবং নিজে একাই মক্কায় থেকে গেলেন। এবং এটা তিনি এজন্যই করেছিলেন যে, তখনও পর্যন্ত তাঁর হিজরত করবার আদেশ দেননি।

তিনি যখনই খোদাতাআলার কালাম (কুরআন) শুনতেন তখনই আবেগে আকুল হয়ে যেতেন এবং তাঁর চোখ অশ্রুতে ভরে ওঠতো। বিশেষতঃ, ঐ সকল আয়াত শুনলে, যেগুলিতে তাঁর দায়িত্ব ও জিম্মাদারীর প্রতি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'আমাকে কুরআন শরীফের কিছু আয়াত পড়ে শোনাও।' আমি বললাম ইয়া রসূলাল্লাহ্! কুরআন তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে, আমি আপনাকে কি শোনাব!' তিনি বললেন, অন্য লোকদের কাছ থেকেও কুরআন পড়া শুনতে আমার খুব ভাল লাগে'। তখন আমি তাঁকে সূরা নিসা পড়ে শোনাতে লাগলাম। পড়তে পড়তে যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম ঃ

(অনুবাদ ঃ ঐ সময়ের অবস্থা কী হবে যখন আমরা প্রত্যেক জাতি বা উম্মত থেকে তাদের নবীকে সেই উম্মতের সামনে খাড়া করে সেই উম্মতের হিসাব নিব! এবং তোমাকেও তোমার উম্মতের সামনে খাড়া করে তাদের হিসাব নিব।)–তখন রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ব্যস! এখন থামো! এখন থামো!' আমি তাঁর দিকে তাকালাম, দেখলাম তাঁর দু'চোখ ভরে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে (বুখারী)।

নামায-এর অনুবর্তিতা ও পাবন্দীর প্রতি তাঁর এত বেশি খেয়াল ছিল যে, কঠিন অসুখের অবস্থাতেও যখন কিনা ঘরে নামায পড়ার এবং শুয়ে শুয়ে নামায পড়ার এযাযত বা অনুমতি খোদাতাআলার তরফ থেকে রয়েছে–তখনও তিনি অপরের সাহায্য নিয়ে মসজিদে নামায পড়তে আসতেন। একদিকে তিনি নামাযে যেতে না পারায় হযরত আবু বকরকে (রাঃ) নামায পড়াবার হুকুম দিয়ে পাঠালেন কিন্তু একটু পরেই শরীরটা কিছু ভাল লাগায়, তৎক্ষণাত দু'জন মানুষের ঘাড়ে ভর করে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। কিন্তু দুর্বলতা এত বেশি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলছেন, যাওয়ার সময় তাঁর পা দু'টি মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার সবখানেই আনন্দ প্রকাশ ও সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাততালি দেওয়া হয়। আরবদের মধ্যেও এই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু তাঁর (সঃ) কাছে খোদাতাআলার স্মরণ এবং তাঁর যিকর এত বেশি পসন্দনীয় ছিল,যে, এসব ক্ষেত্রেও যিকরে ইলাহী বা আল্লাহ্‌র প্রশংসাসূচক শব্দ উচ্চারণের হুকুম দিয়েছিলেন। যেমন লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একটা কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন, ইতোমধ্যে নামাযেরও সময় উপস্থিত। তিনি হুকুম করলেন, 'আবুবকর! নামায পড়িয়ে দাও।' তারপর জলদি কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনিও মসজিদে গেলেন। মুসল্লীরা যখন বুঝতে পারলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) মসজিদে এসে গেছেন, তখন তাঁরা উৎফুল্ল হয়ে হাততালি দেওয়া শুরু করলেন। এর দ্বারা তারা একদিকে যেমন প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনে তাঁদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠেছে, অপরদিকে তারা আবুবকর (রাঃ)-এর মনোযোগ আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন যে, এখন তাঁকে (রাঃ) ইমামতি ছেড়ে দিতে হবে, কেননা, এখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়েছেন। হযরত আবুবকর পিছে সরে এলেন এবং ইমাম-এর জায়গায় রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য খালি করে দিলেন। নামায-এর পরে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবুবকর! আমি তোমাকে নামায পড়াবার হুকুম দিয়েছিলাম, তুমি কেন আমি আসাতে পিছনে সরে গেলে?' আবুবকর (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র রসূলের উপস্থিতে আবু কোহাফার বেটা কী এমন যোগ্যতা রাখে যে, সে নামায পড়াবে!' এরপর তিনি (সঃ) সাহাবাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমাদের কী দরকার ছিল তালি বাজাবার? খোদাতাআলার যিকর করার সময় তালি বাজানো তো ঠিক না। যদি নামাযের সময় এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, সেদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন, তাহলে হাততালি দেওয়ার বদলে বুলন্দ আওয়াজে খোদার নাম উচ্চারণ করবে। এবং এটা করলেই অন্য সকলের দৃষ্টি আপনা আপনি আকৃষ্ট হবে। (বুখারী)

তিনি (সঃ) খুব কষ্ট করে এবাদত করাও পসন্দ করতেন না। একবার তিনি ঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে দু'টি খাম্বার মাঝখানে একটি রশি ঝুলানো। জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন রশিটা লটকানো হয়েছে? কেউ কেউ বললেন, এটা হযরত যয়নব (রাঃ)এর রশি। যখন তিনি (রাঃ) এবাদত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন তিনি এই রশিটা ধরে নিজেকে শামলিয়ে রাখেন। তিনি (সঃ) বললেন, এমনটা করাতো উচিত না। খুলে ফেলো। প্রত্যেকের উচিত এবাদত ততক্ষণ পর্যন্তই করা যতক্ষণ তার হৃদয় স্বাভাবিক ও প্রফুল্ল থাকে। যখন সে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার বসে পড়া উচিত। এ ধরনের কষ্টকর এবাদতে কোন ফায়দা নেই।" (বুখারী)

শির্ক বা অংশীবাদিতার প্রতি তাঁর (সঃ) এত বেশি ঘৃণা ছিল যে, মৃত্যুর সময়েও যখন তিনি জান-কান্দানির কষ্টে কখনো ডানে এবং কখনো বামে করোট ফিরছিলেন, তখনও বল্‌তেছিলেন 'খোদা ঐসব ইহুদী ও নাসেরার ওপর লানত করুন, অভিসম্পাৎ করুন, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে, (বুখারী)। অর্থাৎ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোর ওপর সিজদা দেয় এবং তাঁদের (আঃ) কাছে প্রার্থনা জানায়। আঁ হযরত (সঃ)-এর উদ্দেশ্যে এটাই ছিল যে, তাঁর উম্মত যদি এই ধরনের কাজ করে, তাহলে তারা যেন মনে না করে যে, তারা তার দোয়ার হকদার হবে বরং তিনি তাদের উপরে দারুণভাবে অসন্তুষ্ট হবেন। খোদাতাআলার জন্য আঁ হযরত (সঃ)-এর গায়রত বা আত্মাভিমানের কথা তাঁর জীবনীতে বর্ণিত রয়েছে। মক্কার লোকেরা তাঁর সামনে প্রত্যেক প্রকারের উৎকোচ বা রিশ্‌ওয়াত পেশ করেছিল, শুধু এ জন্যই যে, তিনি যেন মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে কিছু না বলেন, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে না বলেন। তাঁর চাচা আবু তালেবও তাঁকে এ বিষয়ে সুপারিশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন , 'তুমি যদি এ কথা মেনে নাও, এবং আমি যদি তোমাকে না ছাড়ি , তাহলে আমার জাতি আমাকেই ছেড়ে দেবে, পরিত্যাগ করবে। (আবু তালেবের) এই কথার উত্তরে তিনি (সঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার চাচা! এই লোকগুলি যদি সূর্যকে আমার ডানে এবং চন্দ্রকে আমার বামে এনে খাড়া করে দেয়, তবুও আমি এক আল্লাহ্র তৌহীদ বা একত্বের প্রচার হতে বিরত হতে পারব না।' ঠিক একইভাবে, ওহোদ-এর যুদ্ধের সময়ে মুসলমানরা যখন আহত এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় এক পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়েছিল, এবং দুশমন তাদের সমর-সজ্জা ও সরঞ্জামসহ আনন্দে শ্লোগান দিচ্ছিল,'উলো হোবল, উলো হোবল'–অর্থাৎ হোবলের মহিমা উন্নত হোক, হোবল-এর মহিমা উন্নত হোক। তখন তিনি (সঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে যারা শত্রুর দৃষ্টির আড়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তখন লুকানো অবস্থায় থাকাটাই ছিল তাঁদের জন্য মঙ্গলজনক–তাঁদের হুকুম দিলেন, 'জবাব দাও, আল্লাহো আ'লা ওয়া আজাল্লো, আল্লাহো আ'লা ওয়া আজাল্লো। আল্লাহ্র মহিমাই সবার উর্ধ্বে উন্নত তিনি শক্তি ও প্রতাপের অধিপতি, আল্লাহ্ই বিজয় ও মহাপ্রতাপের অধিকারী।

খোদাতাআলার জন্য রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে গায়রত বা আত্মাভিমান ছিল, তার আরও একটি মহান-আজিমুশ্‌শান-দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই তাঁর জীবনীতে। ইসলামের পূর্বে সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে এই ধারণাটা প্রচলিত ছিল যে, নবীগণের খুশী ও অ-খুশীর কারণেই যমীন ও আসমানে পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে; এবং আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির নিয়ন্ত্রণও তাঁদের হাতে। এমনকি একজন নবী সম্পর্কে এমন কথাও বলা হতো যে, তিনি সূর্যকে বলেছিলেন, 'থেমে যাও'। এবং সূর্যটা নাকি থেমেই গিয়েছিল। আর একজনের সম্পর্কে বলা হতো যে, তিনি চাঁদের পরিক্রমণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অপর একজন পানি স্রোতকে স্থির করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম এই জাতীয় ধ্যান-ধারণার ভ্রম প্রকাশ করে দিয়েছিল। এবং বলে দিয়েছিল যে, এগুলো আসলে রূপক বর্ণনা ; এগুলো থেকে লাভবান না হয়ে, মানুষ বরং উল্টো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল, কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল। তথাপি এগুলোর (এই কুসংস্কার ও ভ্রান্ত-বিশ্বাসগুলোর)–অপনোদন সত্ত্বেও, কিছু কিছু মানুষের মনের ওপরে ঐ জাতীয় ধারণার প্রভাব থেকেই গিয়েছিল। যথা, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ বয়সের একমাত্র পুত্র সন্তান সাহেবযাদা ইব্রাহীম আড়াই বছর বয়সে মারা গেলেন। তখন ঘটনাক্রমে সেদিন সূর্যগ্রহণ লাগলো। সেদিন কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় প্রচার শুরু করে দিলো যে, দেখ! রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলের মৃত্যুতে সূর্য অন্ধকার হয়ে গেছে। এই কথা যখন রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হলেন। এবং তিনি এতে চুপ করেও থাকলেন না। বরং, তা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন, এবং বললেন 'চন্দ্র এবং সূর্য তো খোদাতাআলার নির্ধারিত নিয়মাবলী প্রকাশকারী ও অনুসরণকারী অস্তিত্ব। ছোট কিংবা বড় কোন মানুষের জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক? (বুখারী)। যখন কোন ব্যক্তি আরবের প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী বলতো যে, অমুক নক্ষত্র আকাশের অমুক অবস্থানে আসার দরুন বৃষ্টি হলো ; তখন তাঁর (সঃ) চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিত এবং তিনি বলতেন, 'হে লোকেরা! খোদাতাআলার নেয়ামতসমূহকে তোমরা কেন অন্য কিছুর প্রতি আরোপ করছো? বৃষ্টি ইত্যাদি সব কিছুই খোদাতাআলার নির্ধারিত নিয়মে হয়ে থাকে। এ সব কোন দেবতা বা অন্য কোন আধ্যাত্ম শক্তির কৃপার কারণে কিংবা তাদের কোন পুরস্কার দানের কারণে অবতীর্ণ হয় না। (মুসলিম)।

অনুবাদ– শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

কিংবদন্তি মহাপুরুষ হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:)

পৃথিবীতে কিছু-কিছু ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম হয়, যাদের সুবিশাল কর্মময় জীবন সাধারণ মানুষের জন্য পাথেয় এবং অনন্য আদর্শতুল্য হয়ে থাকে। তাদেরই একজনকে নিয়ে আজকের লেখা। আর দিগ্বিজয়ী-বিপ্লবী এ মহাপুরুষ হলেন আমাদের সবার প্রিয় হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:)। খলীফা রাবে (রাহে:) ছিলেন এক অসাধারণ গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। ছিল ঐশী এবং বাহ্যিক নেতৃত্বের যাবতীয় গুণাবলী তাঁর চরিত্রে বিদ্যমান। তাঁর মেধা-প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা-দূরদর্শিতা, বিচার-বিশ্লেষণের পারঙ্গমতা সব কিছুই যেন ঐশী ইঙ্গিতে পরিচালিত হতো। এ মানুষটি ছিলেন কোটি-কোটি প্রাণের প্রিয় মানুষ। এক অদ্ভুত ভালবাসার বন্ধনে তিনি মানুষকে আপন করে নিতেন। আর সাধারণ মানুষও তাঁকে অতি প্রিয়জনের চেয়ে প্রিয়তর জ্ঞান করত। একবার যার সাথে হুযূরের একান্তে সাক্ষাত হত তাকে হুযূর আজীবন মনে রাখতেন।

মানবতার প্রতি খলীফা রাবে (রাহে:) এর ছিল বিশেষ মমত্ববোধ। পৃথিবীর সকল ধর্মের-সকল মতের মানুষের প্রতি তিনি অগাধ মমতা আর ভালবাসা রাখতেন। বাঙালি জাতির বিশেষত বাংলাদেশের প্রতি তাঁর অকৃতিম ভালবাসা আর অনুগ্রহ দেখে মনে হতো তিনিও যেন একজন খাঁটি বাঙালি। আসলে মহা মানবদের যে কোন জাত বা গোত্র থাকে না তাই তিনি শিখিয়েছেন মানুষকে। শিশুদের প্রতিও তাঁর অসীম মমত্ববোধ ছিল, শিশুদের সাথে হুযূরের সাক্ষাতকারগুলো যেন এক-একটা জীবন্ত উপখ্যান। পৃথিবীর যে প্রান্তেই গেছেন সেখানেই শিশুদের আনন্দ উপভোগের জন্য তিনি কোন না কোন ব্যবস্থা রেখেছেন। হুযূরের সাথে দেখা করতে গিয়ে কোন শিশু খালি হাতে আসেনি কখনো। শিশুদের আসরে হুযূর যেন নিজেই শিশু বনে যেতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে ছিলেন এজন অনলবর্ষী বক্তা। তাঁর বাগ্মীতা,বাচনভঙ্গি, শব্দ চয়ন, উচ্চারণ ছিল দারুণভাবে উপভোগ্য। তাঁর বক্তৃতার মাঝে অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল যা মানুষকে ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ করে রাখত। সময়ের প্রয়োজন আর মানুষের মনের দিকে খেয়াল রেখে তিনি চমৎকারভাবে সাজাতেন তাঁর কথামালা। শুধু সাধারণ মানুষই নয় বিভিন্ন জাতি বা সমাজের নেতারা যখন হুযূরের সাথে সাক্ষাত করতেন তারা যেন মোহাবিষ্ট হয়ে হুযূরের কথা শুনতেন। সকল জাতির নেতাদের তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। আর তাই তারাও হুযূরকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখতেন।

হুযূর (রাহে:) এমন এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি প্রচলিত-অপ্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগাধ পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। একাধারে চিকিৎসা বিজ্ঞান-সমাজ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান, দর্শন-যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি সহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থ সারা পৃথিবীর সুধী সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশেষ করে ঃ (০১) Marder in the Name of Allah (০২) Revelation Rationality Knowledge and Truth (০৩) Islam's Response to Contemporary Issues ইত্যাদি। এ গ্রন্থগুলো নিয়ে একটু পরে সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করব।

আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা হয়তো এ মহামানব কে কেবলমাত্র আহমদীয়াতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবেই জানছি, কিন্তু সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন সারা পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীরা এ মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে গবেষণা করবে আর অবাক বিস্ময়ে তাঁর মহান কীর্তিগুলো উপলব্ধি করে যুগ-যুগ ধরে উপকৃত হবে। কেননা ২১ বছরের স্বর্ণোজ্জ্বল খিলাফতকাল ছাড়াও জীবনের প্রত্যেক পরতে-পরতে তিনি যে মহা বিপ্লবের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা কেবল আহমদী তথা মুসলমান জাতির জন্য নয় বরং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, শান্তি ও মুক্তির জন্য মাইল ফলক হয়ে থাকবে। তিনি শান্তির এমন একজন দূত ছিলেন যিনি বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীদের মাঝে বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর বিভ্রান্তি দূর করে জগতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সদা নিয়োজিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সাহায্যে তাঁর উদার হস্ত ছিল সদা সম্প্রসারিত।

আর তাই আমরা এখানে স্বল্প পরিসরে এ মহাপুরুষের বিশাল ও বর্ণাঢ্য জীবনের কিছু দিক অতি সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করছি-

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:)-এর সুযোগ্য উত্তরসূরী হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা:)-এর ৪র্থ স্ত্রী হযরত সৈয়দা মরিয়ম বেগম সাহেবার গর্ভে ১৯২৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে (যা নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্থায়ী কেন্দ্র) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। হুযূরের জন্মের ঠিক পরের দিনই (১৯ ডিসেম্বর) কাদিয়ান সরাসরি রেল যোগাযোগের আওতাভূক্ত হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাটালা থেকে কাদিয়ানে আসার পথের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হল। ছোটবেলায় তিনি তাঁর দাদী হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহে মাওউদ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ:)-এর যোগ্য সহধর্মিনী হযরত নূসরত জাঁহা বেগম সাহেবা অর্থ্যাৎ হযরত আম্মাজান (রা:)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা তিনি ছোটবেলায় ঘরেই লাভ করেন। যার ফলে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শিশুকাল থেকেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের এক অনন্য ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকেই তিনি দূরন্ত সাহস, অদম্য জ্ঞান পিপাসা ও অসীম মেধার স্বাক্ষর রাখেন। প্রকৃতির দর্শন, শিকারের নেশা, অজানাকে জানা আর অজেয়কে জয় করার সুদৃঢ় বাসনা ছিল তার কিশোর বয়সের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম।

যৌবনের দুরন্ত দিনগুলিতেও তিনি তাকওয়া আর পরহেজগারীর যে মাত্রা অর্জন করে ছিলেন তা সত্যিই বিরল। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন, বিশেষত মানবতার প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা ও সযত্ন কর্তব্যবোধ মানুষকে বিমুগ্ধ করত। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রেক্ষিতে পাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের সম্মিলিত আক্রমণে যখন মুসলমানদের জীবনযাত্রা দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পরেছিল তখন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের বয়স মাত্র ১৯ বছর। এ অমানবিক ঘটনায় তিনি বিচলিত হয়ে পরেন। মানবতার প্রতি গভীর ভালবাসা আর কর্তব্যবোধ তাঁকে দারুণভাবে নাড়া দেয়। অবশেষে খলীফা সানী (রা:)-এর তাহ্‌রীকে সাড়া দিয়ে এ বয়সেই তিনি অত্যাচারিত মুসলমানদের রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন জেনেও দিনরাত পরিশ্রম করে হাজার হাজার নিরীহ মুসলমান নারী-পুরুষকে কাদিয়ানে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার মত কঠিন ব্রতে অবতীর্ণ হন।

সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয়েছিল কাদিয়ানেই। কাদিয়ানের তালিমুল ইসলাম স্কুল থেকে তিনি মেট্রিক পাশ করার পরে ১৯৪৪ সালে লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। অতপর রাবওয়া আহমদীয়া মিশনারী কলেজ (জামেয়া আহমদীয়া) থেকে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেন এবং এরপর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী বিষয়ে সম্মান ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি তাঁর পিতার সাথে প্রথম ইংল্যান্ড ভ্রমন করেন। তখন

তাঁর পিতা তাঁকে ইংরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য উপদেশ দিলে তিনি নির্দ্বিধায় তা পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি লন্ডনের বিখ্যাত School of Oriental and African Studies (SOAS) থেকেও ডিগ্রী লাভ করেন। এ সময়ে ইংল্যান্ডে তিনি প্রায় আড়াই বছর অবস্থান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও পশ্চিম ইউরোপের বেশ কয়েক দেশ ভ্রমন করেন। মূলত এর মাধ্যমে তিনি সার্বজনীন শিক্ষা লাভ করেন।

সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব ১৯৫৭ সালে আব্দুর রশীদ সাহেব (রা:)-এর কন্যা আসেফা বেগম সাহেবাকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন ৪ কন্যা সন্তানের জনক।

১৯৫৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা:) 'ওয়াকফে জাদীদের' ঘোষণা দিলে সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব 'লাব্বায়েক' বলে স্বীয় জীবন ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবায় উৎসর্গ করেন। ১৯৫৭ সালেই খলীফা সানী (রা:) প্রথম 'নাযিম ওয়াকফে জাদীদ' হিসেবে সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেবকে নিযুক্তি দেন। 'ওয়াকফে জাদীদে' কাজ করার সুবাদে তিনি তদানিন্তন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে-ঘুরে আহমদীয়াতের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। যার কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কে হুযূর (রাহে:)-এর একটি সুস্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন খিলাফতের দায়িত্ব পালনকালে আমরা দেখতে পাই। পরবর্তীকালে তিনি সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং সদর মজলিস আনসারুল্লাহর গুরুদায়িত্বসহ জামাতের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে:)-এর ইন্তেকালের পর ১৯৮২ সালের ১০ জুন তারিখে যুহরের নামাযের পরে রাবওয়ার মসজিদে মুবারকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা:) কর্তৃক নির্ধারিত মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত (খিলাফত নির্বাচক মন্ডলী পরিষদ) তাঁকে হযরত ইমাম মাহদী (আ:)-এর চতুর্থ খীলফা হিসেবে নির্বাচিত করেন। হুযূর (রাহে:) খিলাফতের আসীনে অধিষ্ঠিত হয়েই ঘোষণা করেন:'আল্লাহর ফযলে এরপরে খিলাফত নিয়ে আর কোন ষড়যন্ত্র হবেনা'। মূলত এটি ছিল ঐশী ইঙ্গিতে একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যার পূর্ণতা আমরা হুযূর (রাহে:)-এর ইন্তেকালের পরে খিলাফতে খামেসার নির্বাচনে অবলোকন করেছি। আলহামদুলিল্লাহি যালিক।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:)-এর খিলাফতের সবচে' উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে 'হিযরত' চিরকাল খোদাতাআলার কুদরত ও ঐশী নিদর্শনের স্বর্ণোজ্বল ইতিহাস হয়ে থাকবে। হুযূর (রাহে)-এর হিযরতের পেছনে রয়েছে বিরাট অধ্যায়। হুযূর (রাহে:) খিলাফতের আসীনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৩ সালে দাওয়াতী ইলাল্লাহ্ বা তবলীগের গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জামাতের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী খুতবা প্রদাণ করেন। হুযূর (রাহে:)-এর এ খুতবার ফলস্বরূপ জামাতের মাঝে তবলীগের জন্য এক নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। হুযূর (রাহে:) স্বয়ং প্রতি বৃহস্পতিবার রাবওয়ায় বিশেষ তবলীগি সেমিনারের সূচনা করেন। এতে পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে-দলে লোক আসতে থাকে এবং আহমদীয়াতের সত্যতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের অনেকেই আহমদীয়াত গ্রহণ করতে থাকেন। হুযূর (রাহে:)-এর তবলীগের ক্যাসেট সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পরলে এর মাধ্যমে তবলীগের ময়দানে এক মহাজাগরণ সৃষ্ট হয়।

পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক জান্তা জেনারেল জিয়াউল হকের কাছে গোয়েন্দাদের এবং মোল্লাদের পক্ষ থেকে এসব রিপোর্ট পৌছালে সামরিক জান্তার ঘুম হারাম হয়ে যায়। এভাবে দিন-দিন আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা চালু থাকলে তাদের দিন যে শেষ হতে বাকি থাকবেনা তা তারা উপলব্ধি করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক জামাতে আহমদীয়ার উপরে বাধ্যবাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে 'কাদিয়ানী নিষিদ্ধ অর্ডিন্যান্স ' নামে এক অতি জঘন্য ও কুখ্যাত ঘোষণা জারি করেন। এ অন্যায় আইন জারীর কারণে হুযূর (রাহে:)-এর পক্ষে পাকিস্তানে থেকে নিজ দায়িত্ব পালন সম্ভব ছিলনা বিধায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে:) এ বছরের ২৯ এপ্রিল তারিখে ঐশী ইঙ্গিতে প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে লন্ডনে হিযরত করতে বাধ্য হন। হুযূর (রাহে:)-এর এ মহান হিযরত ছিল জীবন্ত কাদের খোদার জলন্ত এক মহানিদর্শন। যার বর্ণনা পরে সংক্ষেপে তুলে ধরবো।

হুযূর (রাহে:)-এর হিযরতের কারণে ইংল্যান্ডের জলসা সালানা আর্ন্তজাতিক জলসায় রূপলাভ করে। ১৯৮৫ সালের ৫-৭ এপ্রিল ইংল্যান্ডের সালানা জলসায় প্রথমবারের মত ৪৮টি দেশের হাজার-হাজার আহমদী অংশগ্রহন করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ত এ ধারা অব্যহত রয়েছে বরং দিন-দিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। ১৯৮৪ সালে পকিস্তান সরকার 'কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স' জারি করে হুযূর (রাহে:)-এর কোন ক্ষতি করতে না পারলেও পাকিস্তানের নিরীহ আহমদীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। পাকিস্তানে আহমদীদের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ১৯৮৮ সালের ৩ জুন ও ১০ জুনের জুমআর খুতবার মাধ্যমে হুযূর (রাহে:) পাকিস্তানের অত্যাচারী সামরিক জান্তাসহ বৈরী আহমদীয়া নেতৃবৃন্দ ও মোল্লাদের উদ্দেশ্যে যুগান্তকারী 'মুবাহালার' চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। যার নিদর্শন স্বরূপ মাত্র মাস দু'য়েকের ব্যবধানে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ১৭ আগষ্ট ১১ জন সামরিক পদস্থ কর্মকর্তা সহ এক বিমান দূর্ঘটনায় করুন ভাবে নিহত হন।

১৯৮৪ সালে হুযূর (রাহে:) যখন পাকিস্তান থেকে হিযরত করেন তখন বিশ্বে মাত্র ৮০টির মত দেশে আহমদীয়াতের বিস্তৃতি ছিল । কিন্তু হুযূরের হিযরতের পরে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের বিস্তৃতি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে। আল্লাহর ফযলে হুযূরের জীবদ্দশায়ই জামাত পৃথিবীর ১৮০টি দেশে বিস্তৃতি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৩ সালে হুযূর (রাহে:) 'আর্ন্তজাতিক বয়াতের' তাহ্রীক করেন। হুযূরের এ বিপ্লবাত্মক তাহ্রীকের আওতায় প্রতি বছর দলে-দলে লোক আহমদীয়া জামাতে দাখিল হতে শুরু করে। নিম্নে ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আর্ন্তজাতিক বয়াতের একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে হুযূর (রাহে:)-এর বিপ্লবাত্মক তাহরিকের চিত্র হৃদয়াঙ্গম করা যায়ঃ

নং	বয়াতের সাল	বয়াতের টার্গেট	বয়াতের সংখ্যা
১	১৯৯৩	১ লাখ	২ লাখ ৪ হাজার ৩০৮ জন
২	১৯৯৪	২ লাখ	৪ লাখ ১৮ হাজার ২০৬ জন
৩	১৯৯৫	৪ লাখ	৮ লাখ ৪৫ হাজার ২৯৪ জন
৪	১৯৯৬	৮ লাখ	১৬ লাখ ৬ হাজার ৭২১ জন
৫	১৯৯৭	১৬ লাখ	৩০ লাখ ৩৪ হাজার ৫৮৪ জন
৬	১৯৯৮	৩২ লাখ	৫০ লাখ ০৪ হাজার ০৬ জন
৭	১৯৯৯	৬৪ লাখ	০১ কোটি ০৮ লাখ ২০ হাজার ২২৬ জন
৮	২০০০	০২ কোটি	০৪ কোটি ১৩ লাখ ০৮ হাজার ৩৭৬ জন
৯	২০০১	০৪ কোটি	০৮ কোটি ১০ লাখ ৬ হাজার ৭২১ জন

সংকলন- **মৌঃ এস. এম. তৌহিদুল ইসলাম**

খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী

(তৃতীয় কিস্তি)

কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্ব ধর্মীয় সম্মেলনে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত শিক্ষিত সুধীজনের নিকট অযুক্তির ও অনৈসলামিক বক্তব্য শুনে, বঙ্গীয় আমীর সাহেব বিস্মিত হন। তাই এর জবাব প্রদানের উদ্দেশ্যে দু'মাস পরই ২২ও ২৩ মে ১৯৩৭ সালে বগুড়ার এডওয়ার্ড করোনেশন হলে উত্তর বঙ্গ জামাতে আহমদীয়ার অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন (জলসা) আয়োজন করেন। এ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে SIR FRANCIS YOUNG HUSBAND-এর ভ্রান্ত বক্তব্য অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে খন্ডনে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের তুলনামূলক আলোচনায় প্রমাণ করেন, ইসলামই আল্লাহ্তাআলার মনোনিত, নিরংকুশ সত্যনিষ্ঠ ও সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম। বিশ্ব শান্তির একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মের সাম্রাজ্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে প্রদত্ত বক্তব্যকে আল্লামা জিল্লুর রহমান খন্ডন করে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তৃতার শিরোনাম ছিল 'ধর্মের সাম্রাজ্যবাদ এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ'। ঐশী বাণীর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত তাদের এ বক্তব্য তখনকার মাসিক আহমদীর জুলাই ও আগষ্ট ১৯৩৭ সালের সংখ্যায় প্রকাশ করে তা বহুল প্রচার করা হয়। ফলে কলকাতা সম্মেলনের অসারতায় বগুড়া সম্মেলনের সফলতা শিক্ষিত সূধী মহলে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় পুনরায় সর্ব ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয় । তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর চৌধুরী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) স্বরচিত 'ইসলাম' নামের একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য হুযূরের নির্দেশে কাদিয়ান হয়ে কলকাতায় চলে আসেন। এবং ঐশী নেতার ঐশী ব্যাখ্যায় রচিত অমূল্য প্রবন্ধটি তিনি প্রাণের আবেগে সম্মেলনের অসংখ্যক শ্রোতার মাঝে উপস্থাপন করেন। ইসলামের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য এবং বিশ্ব শান্তির উপায় ও অবলম্বন প্রাঞ্জল ভাষায় তোলে ধরেন। ফলে অসংখ্য শ্রোতা মন্ডলী মুগ্ধ ও বিমোহিত হন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় ১৮৯৬ সালে লাহোরের টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-লিখিত 'ইসলামী উসুল কি ফিলসাফী' নামের প্রবন্ধটি তাঁর পক্ষ থেকে হযরত আব্দুল করিম (রাঃ) কর্তৃক পঠিত হলে তা যেমন সম্মেলনে সর্বাধিক ভূয়সী প্রশংসিত এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল তেমনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)-এর রচিত 'ইসলাম' নামের প্রবন্ধটি সে দিন বীর বাঙ্গালী আবুল হাশেমের সুমধুর কণ্ঠে কলকাতা সম্মেলনে পাঠ করা হলে তা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য পায়। তিনি আর এক আব্দুল করিম (রাঃ) এর ভূমিকাই পালন করেন। তদুপরি আবুল হাশেম সাহেব 'আহমদীয়া মতবাদ' নামে তাঁর নিজের রচিত একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস তোলে ধরেন। এ সম্মেলন প্রসঙ্গে চৌধুরী সাহেব বলেন, সম্মেলনে ভারতের প্রায় সকল ধর্মেরই বক্তারা সমবেত হয়েছিলেন। ৮ ডিসেম্বর হতে ১১ ডিসেম্বর ১৯৩৭ তারিখ পর্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সভার কার্য পরিচালিত হয়। সভার কার্যাবলী দেখে আমার মনে এই ধারণা হয় যে, জগৎ এখন আহমদীয়া মতবাদের সূত্রে এবং মন্ত্রগুলো সাদরে শ্রবণ ও গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অপেক্ষা কেবল মাত্র আমাদের চেষ্টা ও কুরবানীর। জগৎ ক্ষুধিত ও পিপাসিত। খাদ্য ও পানীয় আমাদের হাতে। (মাসিক আহমদী জানুয়ারী ১৯৩৮)। আহমদীয়া জামাতের কৃতিসন্তান বঙ্গীয় আমীর চৌধুরী সাহেবের এ কীর্তিমান অবদান অম্লান হয়ে আছে।

বিশ্ব মানবের শান্তির দূত রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত রসূল করীম (সঃ)। তাঁর জীবনাদর্শই মানব জীবনের জন্য অনুকরণীয় এবং শান্তির সোপান। কিন্তু ১৯২৮ সালে তাঁর পুতঃপবিত্র জীবনাদর্শকে কলংকিত করে 'রঙ্গিলা রসূল' নামে একটি বই প্রকাশিত হয় । আমীরুল মোমেনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এতে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হন। তাই তিনি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সমন্বয়ে আদর্শ মানব (সঃ)-এর পুতঃপবিত্র জীবনাদর্শকে বহুল আলোচনার উদ্দেশ্যে সকল জামাতে নবী দিবস পালনের নির্দেশ দেন। এ শিরধার্য আদেশ পালনে বঙ্গীয় আমীর চৌধুরী সাহেব বঙ্গদেশের জামাতগুলোকে চাঙ্গা করে তোলেন। ফলে বিভিন্ন জামাতের উদ্যোগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পন্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে জাঁকজমকভাবে নবী দিবস পালিত হয়। দেবে আর নেবে মিলাবে মিলবে যাবে না ফিরে কর্মসূচীতে বিভিন্ন ধর্মের পন্ডিতরা হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পুতঃপবিত্র জীবনাদর্শের ওপর প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। হযরত রসূল করীম (সঃ) সর্বকালের সর্বযুগের মানব জাতির আদর্শ মানব, সকল ধর্মের ধর্মগুরু এবং তাঁর সারাটা জীবন পুতঃপবিত্র ছিল এ চিরন্তন সত্যটি সবার বক্তব্য থেকে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। আর তার ফলশ্রুতিতেই বিশ্ব নবীর উম্মতে বিশ্বরূপে আবির্ভূত আখেরি জামানার ইমামুজ্জামানের সত্যতার প্রতিধ্বনি হয়। ত্রিশ দশকে চৌধুরী সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অসংখ্যক নবী দিবস থেকে ক'টি নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

(ক) ২৪ অক্টোবর ১৯৩৫ সালে ঢাকার কার্জন হলে আমাদের লন্ডন মিশনারী মাওলানা আব্দুর রহিম নাইয়ার ও অল ইন্ডিয়া সাইকেল টোরিষ্ট মৌলভী মোহাম্মদ হানিফ কোরাইশীর শুভাগমনে নবী দিবস পালিত হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে জামাতের বিভিন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিদের সাথে ঢাকা নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা ঊষারাণী রায়, হযরত রসূল করীম (সঃ) এর জীবনাদর্শের উপর প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন। এতে হিন্দু মুসলিম আটশত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জামাতের অনেক

ট্রাক্ট বিতরণ করা হয়। অতঃপর ঢাকার ব্রাহ্ম মন্দিরেও অনুরূপ অনুষ্ঠান করা হয় (মাসিক আহমদী জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৩৬)।

(খ) ঢাকায় জগন্নাথ ইন্টারমেডিয়েট কলেজ (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ–লেখক) হলে নিখিল আহমদীয়া জামাতের নির্ধারিত ৩১ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখে নবী দিবস পালিত হয়। এতে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফিলোসফির হেড প্রফেসার হরিদাস ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করেন। হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টান সর্ব সম্প্রদায়ের বহু উচ্চ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যোগ দেন। উপস্থিত শ্রোতা মন্ডলীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় হলের বারান্দা ও বাহিরে দাঁড়িয়ে অনেককে বক্তৃতা শ্রবণ করতে হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন–ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঢাকা ইউনিভার্সিটির আরবী ডিপার্টমেন্টের হেড, বাবু গিরিশ চন্দ্র নাগ রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সিষ্টার চারু শীলা দেবী, প্রিন্সিপাল আনন্দা শ্রম, আমীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া এবং জেনারেল সেক্রেটারী বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়া। তাছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বগুড়া এবং আখাউড়ায় জাঁকজমকভাবে অনুরূপ নবী দিবস পালিত হয়। (মসিক আহমদী নভেম্বর, ১৯৩৭)।

(গ) বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ তারিখে কলকাতা আলবার্ট হলে সার্বজনীন ধর্মগুরু দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ কালী দাস নাগ এম এ, ডিলিট সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। বঙ্গদেশের আহমদীয়া সম্প্রদায়ের আমীর খান বাহাদুর মৌলভী আবুল হাশেম খান চৌধুরী এম এ বি টি এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন নিয়োগী সভার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর মিষ্টার আর্দেশীর দীন শাহ বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক আর সি, অধিকারী এম এ, ডাঃ সানাউল্লাহ এম এ, পিএইচডি, মৌলভী দৌলত আহমদ খান খাদেম বি এল, মাওলানা মোহাম্মদ সলীম আহমদীয়া মিশনারী ও স্বামী গভীরানন্দ প্রমুখ বক্তাগণ হযরত জরতস্ত, গৌতম বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আহমদ (আঃ), রামকৃষ্ণ পরম হংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা এবং জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন (পক্ষিক আহমদী, ১৫ অক্টোবর ১৯৩৯)।

উল্লেখ্য, তৎকালে নাজের দাওয়াতে তবলীগ কাদিয়ান কর্তৃক প্রতি বছর নবী দিবস পালনের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দেয়া হত। বিভিন্ন জামাত সাধারণতঃ নির্ধারিত দিনে কিংবা অন্য কোন দিনে জাঁকজমকভাবে নবী দিবস পালন করে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর খান বাহাদুর চৌধুরী আবুল হাশেম সাহেব সম্ভ্রান্ত বংশের উচ্চ শিক্ষিত এবং সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা হওয়ার প্রেক্ষিতে দেশের উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ লোকদের সাথে তার পরিচিতি ও বন্ধুত্ব থাকার কারণে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী উচ্চস্তরের লোকদেরকে আমন্ত্রণে প্রতিবছর নবী দিবস পালিত হয়। ফলে বঙ্গদেশে জামাতে আহমদীয়ার কর্মকান্ডের পরিচিতিতে জোয়ার আসে।

চৌধুরী আবুল হাশেম সাহেবের সময়ে বাংলা ভাষায় জামাতে আহমদীয়ার বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশনায় যুগান্তকারী প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি আসে। মাইল ফলক সৃষ্টি হয়। ১৯২৫ সালে তিনি এবং তাঁর সমমনা সুহৃদ বন্ধুবর মৌলভী মোবারক আলী, গোলাম ছামদানী খাদেম ও মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ প্রমুখ মিলে কলকাতা থেকে যে মাসিক আহমদী পত্রিকাটি প্রকাশনা শুরু করেছিলেন চৌধুরী সাহেব বঙ্গীয় আমীর নিযুক্ত হওয়ার পর ১৯৩৬ সালের জানুয়ারী থেকে জামাতের মুখপত্র হিসাবে ঢাকা থেকে প্রকাশনা শুরু করেন। তখন এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন তৎসময়ে জামাতে আহমদীয়ার নব উদীয়মান উচ্চ শিক্ষিত যুবক মৌলভী আব্দুর রহমান খা। যিনি পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন আমেরিকার মিশনারী ছিলেন। পত্রিকায় লেখনীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমীর সাহেবের সাথে মৌলভী এ, এইচ এম আলী আনোয়ার, আল্লামা জিল্লুর রহমান ও মোজাফফরউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ অবদান রাখেন। পরবর্তীতে বঙ্গীয় আমীর সাহেব পত্রিকাটি ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৮ সাল থেকে মাসিক হতে পাক্ষিক হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেন। যা আজও পাক্ষিক আহমদী হিসাবে তার ঐতিয্যকে ধারণ করে আছে। অনেক চড়াই উৎড়াইয়ের মাঝে এর প্রকাশনা ও জনপ্রিয়তার ক্রমবর্ধমান ধারা প্রবাহমান রয়েছে।

উপরন্তু সুলতানুল কলমের জ্ঞানন্বেষণকারী প্রাদেশিক আমীর সাহেব রূহানী খাযায়েনকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে প্রচারের উদ্দেশ্যে মূল্যবান গ্রন্থ আল ওসীয়ত, কিস্তিয়ে নূহ, জরুরাতুল ইমাম ও তোহফায়ে নদওয়া পুস্তকগুলো বঙ্গানুবাদের ব্যবস্থা করেন। এ পুস্তকগুলো প্রকাশনার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি জামাতে চাঁদার তাহ্‌রীক করলে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়। মৌলভী মোবারক আলী সাহেব ১৯৩৭ সালে তাঁর প্রথম মেয়ে সালেহা খাতুনের বিয়ে উপলক্ষে প্রকাশনা খাতে একশত টাকা চাঁদা প্রদান করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ানের নাযের দাওয়াত ও তবলীগের নিকট আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি ১৯৩৭ সালে একশত টাকা প্রেরণ করেন এবং প্রকাশনার কার্যে প্রাদেশিক আঞ্জুমান যত অর্থ দিবে সদর আঞ্জুমান তার সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৩৮ সালে জামাতের অপর এক বুযুর্গ ভ্রাতা মৌলভী সৈয়দ ইব্রাহীম সাহেব তাঁর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে একশত টাকা প্রদান করেন এবং সদর আঞ্জুমান থেকে দুইশত টাকা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় বিভিন্ন জামাতের ভ্রাতারাও অনেক চাঁদা দান করেন। ফলে ১৯৩৮ সালে আল্ ওসীয়্যত ও কিস্তিয়ে নূহ্ পুস্তক দুটি প্রকাশিত হয়। আল্ ওসীয়ত পুস্তকটির বঙ্গানুবাদ করেন মৌলভী এ এইচ এম আলী আনোয়ার এবং কিস্তিয়ে নূহ্ পুস্তকটি বঙ্গানুবাদকারী হলেন মৌলভী আব্দুর রহমান খা। (পাক্ষিক আহমদী ৩১ আগষ্ট ১৯৩৮)।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

আহমদীয়ত

মূল ঃ কাযী মোহাম্মদ নাযির সাহেব ফাযেল
নাযের তসনীফ ও ইশাআত লিটারেচার

(৫ম কিস্তি)

এথেকে প্রকাশিত হয়, তাঁর (আঃ) দৃষ্টিতে মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগে তরবারীর জিহাদ আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ফরমান অনুযায়ী কেবল মাত্র স্থগিত হয়েছে, নাকি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা হয়েছে? চিরস্থায়ীভাবে বন্ধের কোন ঘোষণা তাঁর পক্ষ থেকে মজুদ নেই। বরং তাঁর পরে জিহাদের শর্তাবলী সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জিহাদ অবশ্য-কর্তব্য বলে থেকে যায়। তিনি (আঃ) লিখেনঃ

"এ যুগে জিহাদ আধ্যাত্মিক আকার ধারণ করেছে আর এ যুগের জিহাদ এটাই যেন কলেমাকে সমুন্নত করার চেষ্টা করা হয়। বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগের জবাব দেয়া হয়। ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যাবলী বিশ্বে বিস্তার দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতাআলা অন্য কোন আকারে পৃথিবীতে জিহাদের প্রকাশ না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত এটাই জিহাদ"।

[হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রাঃ)-এর প্রতি হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এ পত্র। মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল ফাযেল সাহেব (রাঃ) প্রণীত দুরূদ শরীফ নামক পুস্তকে উল্লেখিত]

অতএব হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) যেহেতু নিজের পক্ষ থেকে এ যুগে জিহাদ বন্ধ করে দেন নি বরং এর ঘোষণা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষ থেকে করা হয়েছে আর ভবিষ্যত যুগে এর সম্ভাবনাও স্বীকার করেছেন যে, তরবারীর যুদ্ধের আকারে জিহাদ সৃষ্টিও হতে পারে কিন্তু আমার সময়ে জিহাদের শর্তাবলী মজুদ নেই। আসলে তাঁর (আঃ) প্রতি জিহাদ রহিত করার অভিযোগ সর্বৈব অন্যায় ও অবিচার।

আল্ জিহাদু মাযীন ইলা ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি- শীর্ষক হাদীস তো সহী; কিন্তু এখানে 'জিহাদ' সীমাবদ্ধ অর্থে নয় জিহাদ শব্দ তো ব্যাপক অর্থ বহন করে। ধর্মের খাতিরে এবং কলেমাকে সমুন্নত করার খাতিরে প্রতিটি চেষ্টা-সাধনাকে কুরআন করীম জিহাদে কাবীর (বড় জিহাদ) আখ্যায়িত করে। বলা হয়েছে, জিহাদহুম বিহী জিহাদান কাবীরা অর্থাৎ কুরআন শরীফ প্রচারের মাধ্যমে জিহাদে কাবীর কর। এ ছাড়াও মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোতে জিহাদের আদেশ রয়েছে অথচ মক্কায় সেই যুগে কোন যুদ্ধ করা হয় নি। অতএব জিহাদ সিলসিলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার যুগে বন্ধ হয় নি, কেবল তরবারীর যুদ্ধ হিসাবে জিহাদ স্থগিত হয়েছে। ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি (আঃ) অতি উৎসাহের সাথে অংশ নিয়েছেন। আর তাঁর জামাতও অংশ নিয়েছে ও নিচ্ছে। হাদীস থেকে জানা যায়, অত্যাচারী বাদশাহ্‌র কাছে সত্য কথা বলাও একটি জিহাদ। এতদনুযায়ী সিলসিলা আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা (আঃ) ইংরেজ রাজত্বে বসবাস করেও মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং এখন সারা বিশ্বে তাঁর (আঃ) জামাত ইসলামের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। অতএব মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগে জিহাদ বন্ধ হয় নি। তরবারীর যুদ্ধের আকারে স্থগিত রয়েছে মাত্র। কেননা, যুদ্ধের প্রসঙ্গে কুরআনী নির্দেশ রয়েছে ঃ ক্বাতিলূ ফী সাবিলিল্লাহি ল্লাযীনা ইউক্বাতিলুনাকুম ওয়ালা তা'তাদূ ইন্নাহা লা ইউহিব্বুল মু'তাদীন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে সেসব লোকের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে এসেছে। আর তোমাদের পক্ষ থেকে যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। অর্থাৎ প্রথমে যেন যুদ্ধ আরম্ভ করা না হয় এবং যুদ্ধ-নীতি যেন লংঘিত না হয়। কেননা, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তাআলা পসন্দ করেন না। (সূরা বাকারা ঃ ১৯১)।

জামাতের বাইরের লোকদের সাথে ব্যবহারও কোন নতুন শরীয়তের ভিত্তিতে নয়

জিহাদের মসলার পর নদভী সাহেব জামাতের বাইরের লোকদের কুফরী,তাদেরকে ইমামুস্ সালাত বানানো, তাদের সাথে বিয়ে-সাদী এবং তাদের জানাযাতে, যোগ না দেয়ার নিষেধাজ্ঞাকে একটি নতুন শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন। এসব বিষয় প্রসঙ্গে এটা সুস্পষ্ট যে, এমন সব বিষয়ের প্রকাশ তাঁর বিরুদ্ধে উলামাদের ফতওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই হয়েছে, সূচনা হিসেবে হয় নি। অতএব আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা নিজ পুস্তক হাকীকাতুল ওহী-এর ১২০ পৃষ্ঠায় উলামার ফতওয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন ঃ

"প্রথমে এসব লোক আমার বিপক্ষে কুফরীর ফতওয়া তৈরী করলো এবং প্রায় ২০০ মৌলভী এর ওপর মোহর লাগালো আর আমাকে কাফির সাব্যস্ত করলো। এসব ফতওয়ায় এতটা কঠোরতা অবলম্বন করলো যে, কোন কোন আলেম এটাও লিখলো, এ লোক কুফরীর ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেয়েও নিকৃষ্ট। আর সাধারণভাবে এ ফতওয়া দিলো, এসব লোককে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা উচিত নয়। এসব লোকের সাথে সালাম ও মোসাফাহা (করমর্দন) করা উচিত নয়, তাদের পিছনে নামায পড়া সঠিক নয়। তারা কাফির হয়েছে। বরং এসব লোক যেন মসজিদে প্রবেশ করতে না পারে। কেননা, এরা কাফির। এদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হয়ে যায়। মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদ ধুইয়ে ফেলতে হবে। তাদের মালামাল চুরি করা বৈধ। এসব লোক ওয়াজেবুল কতল অর্থাৎ হত্যার যোগ্য। কেননা, এরা অস্বীকারকারক- আবার এ মিথ্যার প্রতি দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠিয়েছে যে, আমরা নাকি ২০ কোটি মুসলমান ও কলেমায় বিশ্বাসীকে কাফির সাব্যস্ত করেছি; অথচ আমাদের পক্ষ থেকে আগে কোন ফতওয়া দেয়া হয় নি। তাদের আলেমরা নিজেরাই আমাদের ওপর কুফরীর ফতওয়া লিখেছে। আর পাঞ্জাব ও হিন্দুস্তানে হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়েছে এই বলে যে, এসব লোক কাফির আর বোকা লোকেরা এ ফতওয়ার কারণে আমাদের প্রতি এমন ঘৃণাভাব পোষণ করতে লাগলো যে, আমাদের দিকে চেয়ে কোন নরম কথা বলাও তাদের কাছে পাপ বলে মনে হলো। কোন মৌলভী বা অন্য কোন বিরুদ্ধবাদী বা কোন সাজ্জাদনশীন কি এ প্রমাণ দিতে পারেন যে, আমরা তাদের কাফির সাব্যস্ত করেছি? কাগজ-পত্র বা বিজ্ঞাপন বা পত্র-পত্রিকায় আমাদের পক্ষ থেকে এসব লোকদের বিরুদ্ধে কুফরীর ফতওয়া প্রথম প্রচার করা হয়েছে এবং যাতে আমরা মুসলমান বিরুদ্ধবাদীদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছি? কেউ যদি তা উপস্থাপন করতে পারে তাহলে তা উপস্থাপন করুক। নচেৎ স্বয়ং তারা চিন্তা করে দেখুন এ কতটা অবিশ্বস্ততার কাজ যে,

কাফির তো তারা সাব্যস্ত করেছেন আর আমাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠিয়েছেন যে, আমরা সব মুসলমানকে কাফির সাব্যস্ত করেছি আবার যখন আমাদেরকে নিজেদের ফতওয়ার মাধ্যমে কাফির সাব্যস্ত করেছেন আর নিজেরাই এ কথার সাব্যস্তকারীতে পরিণত হয়ে গেছেন যে, মুসলমানকে যে-ব্যক্তি কাফির বলে তার ওপরেই কুফরী উল্টে পড়ে যায়, এমতাবস্থায় তাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী আমরা তাদেরকে কাফির বলি।"

এ উদ্ধৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট, আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার পক্ষ থেকে কুফরীর ফতওয়া প্রথমে দেয়া হয় নি। বরং এসব ব্যাপার অর্থাৎ, কুফরী, ইমামতীর সম্মান, জানাযা ও বিয়ে-শাদীর নিষেধাজ্ঞা বিরুদ্ধবাদী আলেমদের এমন সব ফতওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হয়েছে যাতে আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর জামাতকে কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিয়ে-সাদী ও তাদের ইমামতি ও জানাযাকে অবৈধ সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং নতুন শরীয়ত তো এসব আলেমরা তৈরী করেছে যে, একজন মুসলমান যে কলেমা শাহাদত-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্-এর বিশ্বাসী এবং অন্যান্য সব ঈমানের বিষয়াদিতে বিশ্বাসী তাদেরকে বিনা কারণে ওলামারা কাফির ফতওয়া দিয়েছে আর তাঁর ও তাঁর জামাতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কঠোরতার পথ অবলম্বন করা হয়েছে। তাই রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশ অনুযায়ী -একজন মুসলমানকে কাফির আখ্যাদানকারী স্বয়ং কাফির হয়ে যায়-আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এ অধিকার জন্মে ছিল যে, জাযাউ সাইয়্যেয়াতিন সাইয়্যেয়াতুম মিসলূহা আয়াত অনুযায়ী তাদেরকে কাফির বলেন। কেননা, নবী (সঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফির বলে সেই কুফরী উল্টে তার ওপরই পড়ে। অতএব আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার এরূপ ফতওয়া মুহাম্মদী শরীয়ত অনুযায়ী যথার্থ নাকি কোন নতুন শরীয়ত?

মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব নিজের এ অভিযোগ সুদৃঢ় করার জন্যে যে, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীন-স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী দাবী করেছেন, প্রথমে তিরিয়াকুল কুলূব পুস্তকের নিম্নোক্ত অংশ উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"এ বিষয়েও স্মরণে রাখার যোগ্য যে, নিজের দাবীর অস্বীকারকারীকে কাফির বলা কেবল সে সব নবীর কাজ যারা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে শরীয়ত ও নতুন আদেশ-নিষেধ নিয়ে এসেছেন। কিন্তু শরীয়তধারী ছাড়া যত ইলহাম- প্রাপ্ত ও মুহাদ্দাস (আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপকারী) রয়েছেন তাঁরা আল্লাহ্‌র সমীপে যতই মর্যাদাসম্পন্ন হন না কেন আর ঐশী কথোপকথনে ভূষিত হন না কেন তাদেরকে অস্বীকার করলে কেউ কাফির হতে পারে না"।

আবার এর মোকাবেলায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিম্নোক্ত ৪টি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তিরিয়াকুল কুলূব পুস্তকে কাফির সাব্যস্ত করে দেয়া সেসব নবীর কাজ নির্ধারণ করেছেন যারা শরীয়তধারী ও নতুন বিধি-নিষেধসহ আগমনকারী আর এর বিরুদ্ধে সেসব উদ্ধৃতি, যা নিচে পেশ করা হলো, নিজের অস্বীকারকারীকে কাফির সাব্যস্ত করে দিয়েছে। যদিও তার দাবী নতুন শরীয়ত নিয়ে আসার কারণে-

(১) "সেসব দিন আকাশ থেকে একটি ফিরকার ভিত্তি রাখা হবে। আর খোদা নিজ মুখে এ ফিরকার সমর্থনের উদ্দেশ্যে একটি বিগল বাজাবেন। আর এ বিগলের আহ্বানে প্রত্যেকটি পবিত্র আত্মা এ ফিরকার দিকে আকর্ষিত হবে কেবলমাত্র সেসব লোক ছাড়া যারা আগে থেকেই পাপিষ্ঠ যাদেরকে জাহান্নাম ভরতি করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে" (বরাহীনে আহমদীয়া, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪)।

(২)"আমার কাছে ইলহাম হলো, যে-ব্যক্তি তোমার অনুসরণ করবে না আর তোমার বয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে না তারা খোদা ও রসূলের অবাধ্যতাকারী জাহান্নামে থাকবে" (মিআরুল আখবার, পৃষ্ঠা ৮, কাদিয়ানী মাযহাব থেকে উদ্ধৃত)।

(৩) "খোদাতাআলা আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার নিকট আমার আহ্বান পৌঁছেছে আর সে আমাকে গ্রহণ করে নি সে মুসলমান নয়" (যিকরুল হাকীম, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ২৪ সংকলক, ডাঃ আব্দুল হাকীম সাহেব, উদ্ধৃতি আল ফযল তারিখ, ১৫ জানুয়ারী, ১৯৩৫)।

(৪) "কুফরী দুই প্রকারের; (এক) এক প্রকার এই যে, কোন ব্যক্তি ইসলামকেই অস্বীকার করে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে খোদার রসূল স্বীকার করে না, (দুই) দ্বিতীয় প্রকার কুফরী এই, যেমন মসীহ্ মাওউদকে স্বীকার করে না আর দলীল-প্রমাণ দ্বারা হুজ্জত পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মিথ্যা মনে করে। অথচ তাকে স্বীকার করা ও সত্য বলে জানার জন্যে খোদা ও তাঁর রসূল তাগিদ করেছেন। পূর্বের গ্রন্থগুলোতেও তাগিদ পাওয়া যায় । অতএব তাই সে খোদা ও রসূলের ফরমানের অমান্যকারী কাফির আর গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এ উভয় ধরনের কুফরী একই প্রকারের অধীন। কেননা, যে-ব্যক্তি সনাক্ত করা সত্ত্বেও খোদা ও রসূলের আদেশ মানে না সে কুরআন শরীফ ও হাদীসের প্রকাশ্য বর্ণনানুযায়ী খোদা ও রসূলকে মানে না (হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা, ১৭৯-৮০)।

আর এ ফলাফল উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন যে, তিনি (আঃ) 'তিরিয়াকুল কুলূব'পুস্তকে কাফির সাব্যস্ত করা সেসব নবীদের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন যারা শরীয়তবাহী ও নতুন বিধি-বিধান নিয়ে আগমনকারী এবং এর মোকাবেলার উপরোক্ত ৪টি উদ্ধৃতিতে নিজের অস্বীকারকারীকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। এ কারণে তার দাবী নতুন শরীয়তধারী নবীর।

শেষ উদ্ধৃতিটি যা হাকীকাতুল ওহী থেকে মৌলভী আবুল হাসান নদভী সাহেব উপস্থাপন করেছেন, এথেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, আহমদী জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কুফরীর ২টি প্রকার ভেদ নির্ধারণ করেছেন। প্রথম কুফরী তো হলো গোটা ইসলামকেই অস্বীকার করা আর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করাকেও সাব্যস্ত করেছেন। লোকেরা একে অমুসলিম বলে থাকে। *(চলবে)*

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

আবেগ নয়, বিবেক চাই

আমি একজন আহমদী, তবে কাদিয়ানী নই। কারণ আমার জন্মস্থান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে নয়। আমি জন্মসূত্রে বাঙ্গালি বা বাংলাদেশী, যে কারণে নিজের বা পরিবার পরিজনের কথা না ভেবে ১৯৭১ সালের ভয়াল দিনগুলিতে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়েছি। আমার কলেমা–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (হঃ)। আমার ঈমান ও আকায়েদকে প্রশ্নের ঝাঁপিতে তুলে যাঁরা খতমে নবুওতের মাঠে নেমেছেন তাঁরা আহমদীদের মুখে, মসজিদের দেয়ালের লিখনের মাধ্যমে জেনেছেন তবে বিশ্বাস করেন নি। যদি করতেন তা হলে এত বিশাল আন্দোলনের প্রয়োজনই হতো না। আপনি বলেন আমি 'আহমদ রাসূলুল্লাহ' বলি। নাউযুবিল্লাহ্, আমি কখনই এ কথা বলিনি বা বলবও না। কারণ তা হলে রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)কে শুধু অপমানই করা হয় না বরং অস্বীকার করা হয়, যা একজন মুসলমান হিসাবে কখনই করতে পারি না। কারণ ইসলামের মূলই হচ্ছেন সর্দার এ দু জাঁহা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। আর আপনি কিনা বলেছেন আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। আফসোস, আপনি যদি জানতেন আমি তাঁকে (সঃ) কত গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বাস করি এবং নিজেকে তাঁর একজন খাদেম হিসাবে কত না গর্ববোধ করি।

ভাই আপনি একটা বড় জামাতের অংশই শুধু নন বরং নেতা। আজ আপনার চারপাশে বিশাল শক্তি যার ওপর ভর করে আপনি আমার গভীর বিশ্বাসকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমাকে অমুসলমান বা কাফের ঘোষণা করে ফতোয়া দিচ্ছেন, আর এই ফতোয়া কার্যকর করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। আপনি তো আমার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে দেখেন নি আমার বিশ্বাস কি? রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর কত দৃঢ় ও অবিচল! বিশ্বাস বিশ্বাসই, এর কোন পরিমাপক নেই। ভেবে দেখুন, আপনার বিশ্বাসকেও তো একজন চ্যালেঞ্জ করতে পারে। তখন কেমন করে প্রমাণ দিবনে? তাতেই কি আপনার বিশ্বাস টলে যাবে? যাবে না। কারণ আপনি সেটা বিশ্বাস করেন। আজ যদি আপনার অবস্থা আমার মত হতো অথবা বিপরীত পক্ষে আমারটা আপনার মত হতো তা হলে বুঝতে পারতেন আমার কষ্টটা কত বড়! ধরুন, আপনার বর্তমান ধর্মীয় অনুভূতিতে যদি, আপনার ধ্যান-ধারণা মতে, কেউ আঘাত দেয় যা আপনি ভাবছেন আহমদীরা দিচ্ছে, তাহলে আপনি এতটাই ক্ষিপ্ত, উত্তেজিত ও দিশেহারা হয়ে যান যে সেই তথাকথিত আঘাতকারীকে প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। আসল কথা, আপনার পছন্দ হয় না। তাই অতি ভয়ানক ও নিষ্ঠুরতম পন্থায় অন্যের সযত্ন-লালিত মতবাদ খন্ডন নয় বরং হত্যার মাধ্যমেই তার জবাব বা পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান বা ঘটান। বলুন তো যদি এমন হয় যে আপনার তুলনায় অধিক শক্তিশালী কেউ আপনার মত ও পথ বদলাতে বলেন তখন আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? ভাই, শক্তিতে নয় যুক্তিতে আসুন।

ভাই, আপনার দৃষ্টি বা বিচারে আমি একজন বিধর্মী। তাই আমাকে ধর্মান্তরিত করে মহান আল্লাহ্তাআলার কাছে দু-হাত তুলে শোকরানা আদায় করা একটি অতি উত্তম কাজ। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি আপনি যেমন নামায আদায় করেন, নামাযের সকল তাসবীহ ঠিকমত পাঠ করেন, আমি ঠিক একই কায়দায় নামায আদায় করি। কোথাও কোন রকম কমবেশি করি না। আমিও মহান আল্লাহ্তাআলার খাস রহমতের আশায় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি এবং যখনই সম্ভব হয় তখনই তাহাজ্জুদও আদায় করি। কারণ আমি আমার সকল জানা অজানা গুণাহ্ থেকে মুক্তি পেতে চাই এবং সেই উদ্দেশ্যেই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) প্রতি দুরুদ পাঠ করি। আমিও আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা দিয়ে পাঠ করি–ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আমি যা করি বা যা করছি তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির জন্যই করছি এবং আশা করছি মহান আল্লাহ্তাআলার রহমত আমি পাব। এরপর আপনি আমাকে বিশ্বাস করলেন কি করলেন না তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। কারণ আমার কবরে আপনি যাবেন না, না আমি যাব আপনার কবরে। কোনটা সঠিক পথ ও মত তা বিচারের ভার একমাত্র মহান আল্লাহ্তাআলার, না আপনার, না রাষ্ট্রের বা অন্য কারোর।

আমি জানি আমি যত কথাই বলি না কেন এবং যত যুক্তিই উপস্থাপন করি না কেন তাতে আপনার মন গলবে না। তবুও বলছি আপনি আমার বিষয়টা আল্লাহ্তাআলার কাছে ছেড়ে দিচ্ছেন না কেন? আল্লাহ্তাআলা তো পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন–লা ইকরাহা ফিদ্বীন অর্থাৎ ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। তিনি আরও বলেছেন–লাকুম দ্বিনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন-অর্থাৎ যার যার ধর্ম তার তার। আপনি যদি কুরআনের এই আয়াতসমূহের ওপর দৃঢ়বিশ্বাসী হতেন এবং আপনার তাকওয়া যদি সত্যিই বিশাল হতো তাহলে আপনি অপেক্ষা করতেন। মহান আল্লাহ্তাআলা তো মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন না বরং সেটাকে ধ্বংস করে দেন। আহমদীয়াত যদি মিথ্যা হতো তাহলে আপনি কি করলেন বা না করলেন তার প্রয়োজন ছিল না, মিথ্যা নিজেই ধ্বংস হয়ে যেতো। আপনি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেই পারতেন। অথচ আপনি তা করলেন না। আপনি আমার ভাই রোযাদার শাহ্ আলমের ওপর শক্তির মদমত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইফতারের অল্প সময় পূর্বেই এবং তাঁরই উঠানে তাঁরই স্ত্রীপুত্র, কন্যা ও পরিজনের সামনে লাঠি পেটা করে হত্যা করলেন। শুধুমাত্র এই অজুহাতে যে আপনার সাথে তার মতের মিল নেই। বলতে পারেন এ পর্যন্ত আপনার মতের সাথে কতজনের মনের মিল পেয়েছেন? যারা আপনার সাথে দলবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছেন তারা ছাড়া বিশ্বের আর কতজন আপনার সাথে আছেন? আপনি কি মহান আল্লাহ্তাআলার সেই ঘোষণার কথা ভুলে গেলেন যে সারা দুনিয়া যদি কারো বিরুদ্ধে থাকে শুধু আল্লাহ্তাআলা তাঁর পক্ষে থাকে তবে আল্লাহ্র পক্ষই জয়ী হয়। আবার বিপরীত পক্ষে সারা দুনিয়া যদি কারও পক্ষে থাকে অথচ আল্লাহ্তাআলা তার বিপক্ষে থাকেন তা হলেও আল্লাহ্ই জয়ী হন। আফসোস! আপনি যদি হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে আমার মত মানতেন তা হলে দেখতে পেতেন অমান্য তো দূরের কথা আমি তাঁকে কত গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথেই না

মানি। তিনি যে কত বড় এবং সারা বিশ্বের জন্য আল্লাহ্‌তাআলার প্রেরিত রহমত তা ভাবতেই আমার মন আবেগে আনন্দে বিগলিত হয়ে যায়। আমি অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্বাস করি তিনি শুধু একজন নবীই নন নবীদেরও নবী এবং তিনি বিশ্বনবী। তাঁর সুপারিশ ছাড়া আমি আখিরাতে পার পাব না। আমি বিশ্বাস করি তিনিই শেষ শরীয়তধারী নবী এবং তাঁর পর রোজ কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন শরীয়তধারী নবী আসবেন না। তবে আমি বিশ্বাস করি হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আসবেন এবং তিনি রসূলে করীম (সঃ)-এর অনুগত দাস হবেন। তাঁর নিজের কোন শরীয়ত থাকবে না। কারণ রসূলের শরীয়তই শেষ শরীয়ত, কুরআনই শেষ আসমানি কিতাব, আল্লাহ্‌র নেয়ামত পরিপূর্ণ এবং ইসলাম ধর্ম হিসাবে অনুমোদিত। এবার বলুন, আপনার কোন বিশ্বাসে আঘাত করলাম?

এ কথা ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয় হযরত মুহাম্মদ (সঃ), যিনি আওওয়াল ও আখেরে নবী, এর ধর্মের সংস্কারের জন্য হযরত ঈসা (আঃ) এর মত একজন গোত্রীয় নবীর প্রয়োজন হবে। যদি এটাই হয় তাহলে সৃষ্টিকূলের সর্বশ্রেষ্ঠজনের অপমান হয় না কি? আপনি হয়ত ভাবতে পারছেন না, তবে আমি পারছি। তিনি আমার কাছে এতই প্রিয় যে তাঁর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার খাতিরে আমি আমার পিতামাতার আদেশ অমান্য করতে পারি, নিজের সন্তান-সন্ততি ও বিষয় সম্পত্তি এমন কি সবচেয়ে প্রিয় জীবন সেটাও বিলিয়ে দিতে পারি। তাই লাঠির আঘাত যতই যন্ত্রণাদায়কই হউক না কেন তা সহ্য করে ঈমান ঠিক রাখি, তবু মাথা নোয়াইনা। এ পরীক্ষায় যে আমি পাশ তার প্রমাণ তো বহুবারই পেয়েছেন। যদি কেউ আত্মসমর্পণ করে থাকে তাহলে সেটা সাময়িক চাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা তারা দৃঢ়ভাবে আহমদীয়াতে আস্থাশীল নয়। কারণ কিছু লোক দান খয়রাত পাবার আশায় আহমদী হয়। আমি এতভাবে নিজেকে প্রকাশ করার পরও আপনি বলছেন আমি নাকি মানি না। কারণ আমাকে বুঝার প্রয়োজন আপনার নেই। এ ছাড়া আপনার রয়েছে বড় দল, লাঠি এমন কি প্রশাসনও। সেজন্যই নানা ভুল তথ্য পরিবেশন করে আমার বিরুদ্ধে লোকজনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছেন এবং যখন তখন আক্রমণ করছেন।

আমি আপনার পদক্ষেপকে বুঝতে পারছি না। কারণ, কোথায় একজন অমুসলমানকে মুসলমান বানানোর চেষ্টা করবেন ; সে তো নয় বরং একজন মুসলমানকে অমুসলমান বানানোর জন্য প্রাণপন যুদ্ধ করেছেন। শুধু এটুকুই বুঝি আপনি যেভাবে আপনার ঈসায়ী ধ্যান-ধারণার মাঝে ডুবে আছেন তাতে আমাকে অমুসলমান ঘোষণা না করলে আপনার নিজের মুসলমানীত্বই টিকে না। কারণ আমি যদি প্রকৃত পক্ষাবে মুসলমান হই তাহলে আপনার অস্তিত্ব কোথায়? অন্যথায় এমন আত্মঘাতি পদক্ষেপ নেওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না। দেখুন, আজ যদি কোন অমুসলমানকে মুসলমান বানাতে চান তা হলে কোন কলেমা পড়ে তাকে মুসলামান হতে বলবেন? নিশ্চয়ই আমার সেই কলেমা –লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। অথচ আমি কিন্তু এই কলেমা নিয়মিতভাবে নিষ্ঠার সাথে পাঠ করি এবং আরো যোগ করি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশাহাদুআন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলূহু। এ সকল বিষয় মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং নিজস্ব আয়ের ওপর নিয়মিত যাকাত দিয়ে জীবন যাপন করছি। আর আমার বিশ্বাসটুকু কেড়ে নিয়ে আমাকে অমুসলমান বানানোর জন্য আন্দোলন করছেন। যেখানে ইসলাম কবুল করে এবং শরীয়তের সকল হুকুম আহকাম মান্য করে জীবন যাপন করার পরও আমাকে মুসলমান থাকতে দিচ্ছেন না সেখানে মুসলমান বানানোর জন্য দিনরাত তবলীগ করছেন এ দুটা কি পরস্পর বিরোধী পদক্ষেপ নয়?

আমি যা বুঝি তা হলো প্রতিযোগিতায় আপনি আমার সঙ্গে এঁটে উঠছেন না। তাই এই হন্তারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার দুর্বলতা আপনার পক্ষে কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। বর্তমানে আপনি একজন শক্তিধর মানুষ। আহমদীয়াত কবুল করা মাত্র আপনি যুগ খলীফার সামনে একজন সামান্য মানুষ। সমাজে আপনার দাপট অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অতি ক্ষুদ্র এবং শান্তি প্রিয় এক ধার্মিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লেগেছেন। এর ফলে ধর্ম, জাতি ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর আপনারা উগ্র ধার্মিকতার অনুসারী বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। গত কয়েক শত বৎসরের ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয় যে আপনারা বহু উচ্চমার্গের লোকদের কাফের ফতোয়া দিয়েছিলেন। এই তো সেদিনের কথা-ইংরেজী পড়লে লোকজন কাফের হয়ে যাবে। অথচ আজ ইংরেজী জানার জন্য কত না মাতামাতি!

কাজেই সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। আর নতুন করে কাউকে কাফের বানাবেন না। আমাকে আমার মত করে থাকতে দিন। আল্লাহ্‌তাআলার কাছে দায়ী হতে হয় এমন কাজ করবেন না। মনে রাখবেন, ফতোয়া দিয়ে মুসলমান বানানো যায় না। বহু ফতোয়াবাজী করেছেন। কিন্তু একটি আলপিনও বানাতে পারেন নি। বরং বহু কাফেরদের আবিস্কৃত সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অবলীলাক্রমে ব্যবহার করছেন। তাই আল্লাহ্‌তাআলার পথে আসুন। এটাই শান্তি ও শৃঙ্খলার পথ।

মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্, প্রাক্তন অধ্যাপক

দৃষ্টি আকর্ষণ

- পাক্ষিক আহমদীর নতুন বছর জুলাই- ২০০৫ থেকে শুরু হয়েছে। যাদের চাঁদা বকেয়া আছে অনতিবিলম্বে চাঁদা পরিশোধ করার জন্য বিনীত আবেদন করা হলো।
- যারা স্থানীয় জামাতে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা দিয়ে থাকেন তারা অবশ্যই রশিদের ফটোকপি অথবা চিঠি দিয়ে সেক্রেটারী ইশায়াত বরাবর জানিয়ে দিবেন। যাতে আমাদের হিসাব রাখতে সুবিধা হয়। কেননা স্থানীয় জামাতে চাঁদা দিলে উক্ত চাঁদার রশিদ আমাদের দপ্তরে পৌছাতে অনেক সময় লাগে। অনেক সময় সরাসরি আসলেও সঠিক নাম ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে জন্য চিঠিতে নাম/ ঠিকানা রশিদ নং তারিখ ও টাকার বিবরণ লিখে জানাবেন। তা না হলে চাঁদা পরিশোধ করেও আপনি বকেয়াদার থেকে যেতে পারেন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

"হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ছিলেন নারী মুক্তির পথিকৃত"

আবহমান কাল থেকেই নারী- অবহেলিতা, নির্যাতিতা, উপেক্ষিতা ও বঞ্চিত। বর্তমান যুগের তথাকথিত নারী মুক্তির প্রবক্তাদের সংগ্রাম সত্ত্বেও সে করুন দুর্দশার তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নারীকে সঠিক বা সুষ্ঠ কোন মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। এমন কি ইসলামের আবির্ভাবের পরেও অমুসলিম দেশসমূহে নারী অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করার জন্য নারী জাতিকে সহ্য করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী দুঃসহ লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও অবমাননা। আজ Womens Wberation বা নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে Kate Milled, Germaine Greer, Anne Nurakin এর নাম উচ্চারণ করি এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মেরী উলষ্টন অ্যানী বেসান্ত (Annie Besant) প্যাঙ্গহাষ্ট মারগারেট সাঙ্গার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহিয়সী-মহিলাদের বিরামহীণ সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারী মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে। যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতিদাতা, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির যিনি প্রবক্তা তিনি হচ্ছেন একজন পুরুষ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সন্তান, যাঁর নাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ)। পৃথিবীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহাপুরুষ যিনি নারী জাতিকে বস্তুতপক্ষে প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করেছেন।

পৃথিবীতে ইসলামের আর্বিভাবের পূর্বে নারীকে বলা হতো শয়তানের অঙ্গ (She is the organ of the devie) দংশনের নিমিত্তে সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক (A Scorpion ever ready to sting)। বিষাক্ত বোলতা (A Poisonous wasp) এই অপকথা বলে তারা নারী জাতিকে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করত। নারী জাতির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন সেন্ট বার্নাড, সেন্ট অ্যান্টণী, সেন্ট পল- এর মত বিশ্ববরণ্য ধর্মযাজক ও পুরোহিতগন। টারটুলিয়ান ও (Tartulian) নারীদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন তোমরা কি জান না যে তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন Eve বা মা হাওয়া তোমাদের নারীজাতির উপর ঈশ্বরের দন্ডদেশ আজও বলবৎ রয়েছে। সেই পাপ প্রবনতা ও নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তোমরা নরকের দ্বার স্বরূপ ও নিষিদ্ধ বৃক্ষ সমন্ধে বিধি নিষেধ অমান্যকারীনী এবং ঐশ্বরিক বিধানের লংঘন কারিনী। তাদের অভিমত নারী যখন আদি পাপের উৎস মানুষের জন্মগত পাপের কারণ তখন সকল ভর্ৎসনা ও ঘৃণা নারীরই প্রাপ্য। হিন্দু সমাজে নারী জাতির অবস্থা ছিল অতিব শোচনীয়। নারী পাপ করলে এটা পুরুষের চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হত। মনুর মতে নারীকে দিবারাত্রি অবশ্যই পুরুষের কড়া শাসনে রাখা আবশ্যক। কারণ নারী জন্মগত ভাবেই দুশ্চরিত্রা ও লম্পট। তাকে কঠোর শাসনে না রাখলে সে অবশ্যই বিপথ গামী হবে। হিন্দু সমাজে নারী ছিল অশুভ প্রাণী বিশেষ, অধ্যাপক ইন্দ্রের ভাষায় নারীর ন্যায় এতপাপ পঙ্কিলতাময় প্রাণী আর নেই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারলো দিক। এসমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট। নারীদের ভালবাসা পুরুষদের উচিত নয়। (Porf Indra, staus of women in Mahbhart, P-16) চীন দেশে নারীর অবস্থান ছিল অধিকতর করুণ ও দুর্দশাগ্রস্ত। চীনের ধর্মগ্রন্থে নারীকে বর্ণিত হয়েছে দুঃখের প্রস্রবণ হিসেবে, এটা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তাদের অভিমতে নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। প্রাণী জগতে নারীর চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছুই নাই। বোদ্ধ ধর্মেও শিক্ষা দেওয়া হত যে নারী সাহচর্যে বিধান লাভ করা চলে না। নারী সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। ঐতিহাসিক ওয়েষ্টার মার্ক (Westermark) এর বর্ণনায়" বোদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের জন্য প্রলোভনের যত গুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছেন তার মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদ জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহনীয় শক্তি একীভূত হয়ে আছে যা সমগ্রবিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়" বেটানীও তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে বোদ্ধরা মনে করতেন অতলান্ত গভীরে মৎস্যের গতিবিধির ন্যায় অপ্রেময় ও অবোধ্য, নারীর চরিত্র বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম"। ইহুদিরাও নারীকে সৃষ্টি কর্তার চিরন্তন অভিশাপ বলে গন্য করতো। নারী থেকেই পাপের সূত্রপাত হয় এবং নারীর কারণেই সকলের ধ্বংস অনির্বায। কারণ নারীই সকল দুর্নীতির উৎস। ইহুদীদের সামাজিক প্রার্থনার দশজন পুরুষের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক বিবেচিত হত। কিন্তু নয়জন পুরুষ ও বহু সংখ্যক নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হত না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে কাউনন্সিল অব ওয়াইজ এর এক অধিবেশন রোম নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, "নারীর কোন আত্মা নেই"। ইসলাম এসব ভ্রান্ত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে ঘোষণা করে যে, প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ হয়ে জগতে জন্ম গ্রহণ করে এবং পাপ পুণ্য কোন সহজাত সম্পদ নয়। পাপ পুণ্য প্রত্যেক নর নারীর অর্জিত বস্তু। যখন বিশ্ব ব্যাপী সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের ভোগের জন্য তখন ইসলামের নবী (সঃ) উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন স্ত্রী হচ্ছে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। স্ত্রী হচ্ছে তার গৃহের সম্রাজ্ঞী।

কুরআন মজীদে আল্লাহতাআলা দ্বার্থহীন ভাষায় এরশাদ করেছেন "নারীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের" (২ঃ২২৯)। ইসলামে নারীকে মুহসানাহ" অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সংরক্ষিত দুভেদ্যদুর্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন ঃ তারা (অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগন) পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক (২ঃ১৮৮)। এখানে খোদাতাআলাতো এটা বলেন নি যে তোমাদের স্ত্রীগন কে তোমরা অন্যচোখে দেখ বা তারা তোমাদের মত নয়। যেখানে খোদাতাআলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন একে অপরের পোষাক, তাহলে কেন এত মতভেদ? ইসলামের বিশ্ব নবী রসূলে করীম (সঃ) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, "বিশ্বে বহু অমূল্য সম্পদ রয়েছে কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপরায়ণা স্ত্রী"। একই সঙ্গে তিনি দাবী করেছেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে।" স্ত্রীর অধিকার ও সম্মানের স্বীকৃতি তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা, যে মুসলমান তার স্ত্রীর সাথে যত ভদ্র ও সদাশয়, তার ঈমান ততই পূর্ণতা লাভ করেছে।" ইসলামের নবী নির্দেশ প্রদান করেছেন মাতা ও পিতা উভয়কে শ্রদ্ধা করতে ভক্তি করতে, দু'জনেরই নির্দেশ পালন করতে। কিন্তু একইসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথাও তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" এ কথা পবিত্র

হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বরং ইসলাম ঘোষণা করে যে, কিয়ামতের দিন সংশ্লিষ্ট স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হবে তার স্বামীর স্বভাব-প্রকৃতি কেমন ছিল? তার সাক্ষ্য প্রদানের ওপর স্বামীর বিচারের অনেক কিছুই নির্ভর করবে। সত্যিই ইসলাম নারী জাতিকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মা হিসাবে, স্ত্রী হিসাবে, কন্যা হিসাবে। শুধুমাত্র কথা হিসাবে নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও নারীর মর্যাদার এই স্বীকৃতি সুস্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইসলাস ধর্মে প্রথম যিনি বিশ্বাস এনেছেন, তিনি একজন নারী বিবি খাদিজা (রাঃ)। ইসল্যামের ইতিহাসে প্রথম শাহাদাত বরণ যিনি করেছেন তিনিও একজন নারী হযরত সুমাইয়া (রাঃ)। নবুওয়্যতের কথা প্রথম যিনি জানতে পেরেছিলেন তিনি ও একজন নারী হযরত খাদিজা (রাঃ)। সৃষ্টির ইতিহাসের অদ্বিতীয় ঘটণা পবিত্র "মিরাজ" যার ঘরে হয় এবং প্রথমে যিনি জানতে পারেন তিনিও একজন নারী বিবি উম্মে হানী (রাঃ)। সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের বংশধর যার মাধ্যমে রক্ষিত হচ্ছে তিনিও একজন নারী বিবি ফাতেমা (রাঃ)। রসূল করীম (সঃ) এর পারিবারিক জীবনের খুটিনাটি তথ্যাদি সুন্দর সুষ্ঠভাবে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় যে সব হাদীসে প্রতিফলিত হয়েছে তাও আমরা পাচ্ছি একজন নারীর মাধ্যমে, তিনি হচ্ছেন আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)। এমন কি হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সংকলিত যে "সহীফা" অবলম্বনে হযরত ওসমান (রাঃ) কুরআন শরীফের ঐতিহাসিক অনুলিপিসমূহ প্রণয়ন করেন সেই "সহীফা" সংরক্ষিত ছিল এক মহিলারই কাছে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রাঃ) এর নিকট সংরক্ষিত "সহীফা" অবলম্বনেই হযরত ওসমান (রাঃ) কুরাআন মজীদের অনুলিপি তৈরী করেন।

এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা শুধু মাত্র কাকতালীয় ব্যাপার নয়। এ সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কি অসাধারণ মর্যাদা ও গুরুত্ব ইসলাম নারীকে দিয়েছে। ইসলাম নারীকে শুধু মর্যাদাই দেয়নি, বরং বাস্ত ব ক্ষেত্রেও তাদেরকে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইংল্যান্ডের মত সুসভ্য দেশেও ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে Married Women's Propertyact পাস হবার পর প্রথম বারের মত নারী জাতি পেয়েছে আইনগত ও অর্থনৈতিক অধিকার। কিন্তু তার চেয়ে ১৪শত বৎসর পূর্বেই নারীর আইনগত স্বাধীন সত্তা মেনে নিয়ে ইসলামের নবী (সঃ) নারীকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিটি পুরুষের সঙ্গে পুর্ণ অধিকার দিয়েছেন। ১৪ শত বৎসর পূর্বেই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম বারের মত নির্ধারণ করে দিয়েছেন পিতা- মাতা, পুত্র-কন্যা, ও স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর অংশ ও অধিকার।

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে হযরত খাদিজা (রাঃ), হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ), বিবি সকিনা (রাঃ), হযরত জুবাইদা (রাঃ), হযরত হালিমা (রাঃ), এবং চাঁদ সুলতানা, সুলতানা রাজিয়া, জেবুন্নিসা প্রমুখ বিদুষী মহিলাবৃন্দ জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে অসাধারণ অবদান রেখে যাওয়া সত্ত্বেও এটি দুঃখজনক যে, আজ ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার ও ইসলামের অপব্যাখার দরুন মুসলিম মহিলাদের বিরাট অংশকে অন্ত ঃপুরে বন্দী রাখা হয়েছে। বিভিন্ন ফোতোয়াবাজদের কবলে পড়ে বর্তমান নারী সমাজ নানান সমস্যার মাঝে ডুবে আছেন। শালীনতা ও আব্রুরক্ষা করে সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে বিচরনের অবাধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে পর্দা বলতে শুধু মাত্র নারীর পর্দাই বুঝায়না। ইসলাম দাবী করে নারী ও পুরুষ উভয় সংযত ও পবিত্র জীবন যাপন করবে। শুধু নারীদেরকেই দেহ আবৃত করতে ইসলাম নির্দেশ দেয়নি। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, "বিশ্বাসী পুরুষ দেরকে বল তারা তাদের দৃষ্টি নত করুক ও গুপ্তস্থানগুলি আবৃত রাখুক, এটা তাদের জন্য পবিত্রতা" (২৪ ঃ ২৯)। বর্তমানে পুরুষেরা মনে করে যে পর্দা কেবল নারীর জন্যই কিন্তু খোদা নিজেই বলে দিয়েছেন নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই পর্দা করা ফরয।

নারী স্বাধীনতা বা নারী জাগরণ বলতে অবশ্য ইসলাম নারীর শরীয়ত পরিপন্থী বিচরনের কোন স্বীকৃতি প্রদান করে না। ইসলাম পরিপূর্ণভাবে সামাজিক ধর্ম, ইসলাম বৈরগ্যর ধর্ম নয়। Women's Lib বলতে বর্তমান জগতে যা বোঝায় তা ইলামের চিন্তা-চেতনায় বিধৃত নয়। সহাবস্থানের মাধ্যমে, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্মান ও প্রীতি বিনিময়ে যে সুখময়, শান্তিময় পরিবেশ পরিস্থিতির উদ্ভব ও বিকাশ এবং তৎসহ মর্যাদাদান, এতেই কল্যাণ ও নারীর স্বাধীনতা বিদ্যমান বলে ইসলাম মনে করে। সম্মানীয় দূরত্ব বজায় রেখে আত্মমর্যাদা, মান-সম্মান, ইজ্জত, আব্রু অক্ষুন্ন রেখে, মুসলিম নারীরা সমাজ জীবনে প্রভূত অবদান রেখেছে। ইসলামে লক্ষ করা যায় নারী বীর বেশে যুদ্ধ করেছে, পুরুষকে ধর্মীয় চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেছে। পর্দা বজায় রেখেই নারী এসব দায়িত্ব পালন করেছে। মানব জাতির ঘটনা বহুল ইতিহাসে নারীর অবদান অনস্বীকার্য।

আমরা দেখতে পাই রসূল করীম (সঃ) নারীকে নিয়ে মসজিদে নামায পড়েছেন এবং আজও ইসলাম নারীদেরকে মসজিদ থেকে দূরে থাকতে বলে না। তারা যেন পর্দার আড়ালে পুরুষদের সাথে একই সময় নামায আদায় করে এটাই ইসলামের আদর্শ। কিন্তু সমাজের এমন কিছু কট্টর মোল্লারা রয়েছে যারা মসজিদে নারীদের যেতে বাঁধা দেয়। বুঝিনা যে তারা এত কেন নারীদের প্রতি ক্ষেপা। যেখানে রসূল করীম (সঃ) নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে গেছেন তার পরও কেন আজ নারীদের বাঁধার সম্মুখীন হতে হয় ? আমরা দেখি হজ্বেও নর-নারী কোন পার্থক্য করা হয়না, সবাই এক সাথে পর্দা করে হজ্ব পালন করে যাচ্ছে। একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে নারী করুনার পাত্রী নয়। সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই নারীকে তাদের প্রাপ্য সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বর্তমান বিশ্বেও নারীর অবদান অসীম ও অতুলনীয়। কবি নজরুল ইসলাম তার এক কবিতায় বলেন, "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণ কর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর"। আমরা যদি লক্ষ্য করি তা হলে দেখতে পাই যে, নারী বর্তমানে তাদের যতটুকু মর্যদা পাওয়ার যোগ্য ততটুকু পাচ্ছে না বরং হচ্ছে প্রতিনিয়ত লাঞ্চিত, অপমানিত। একটি পুরুষ একটি নারীর জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম এখানে তো কোন অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম নাই। তা হলে কেন আমরা আজও নারীদের কে সঠিক মর্যদা দিব না, যে মর্যদা রসূল করীম (সঃ) দিয়ে গেছেন। সেই মর্যদাই তাদেরকে দিতে হবে এবং যথাযথ সম্মান করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই নারীর প্রয়োজনীয়তা অনেক অনেক ব্যাপক।

আজ নারীরা আছে বলেই আমরা তাদের যথার্থ কদর বা মূল্য দিচ্ছি না। খোদা না করুক যদি কোন সময় এই জগৎ থেকে নারীর বংশ বৃদ্ধি কমিয়ে দেয়া হয় তখন কি হবে একটু চিন্তা করে দেখুন। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে প্রকৃত ইসলামের আদর্শে আমাদের এই জীবন গড়ে তুলি এবং নারীদেরকে যতটুকু মর্যদা ইসলাম দিয়েছে ততটুকু মেনে চলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করি। আর এতেই সর্বপ্রকার কল্যাণ নিহীত।

মৌঃ মাহমুদ আহমদ সুমন

মুলাকাৎ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষা-ভাষীদের ২৭-৩-২০০১ তারিখের সাক্ষাৎকার

প্রশ্ন নং ১ঃ আমেরিকা থেকে এই প্রশ্নটা হুযূরের নিকট এসেছিল। "আমেরিকায় অ-আহমদী বক্তাগণ প্রায়ই হযরত মুফ্তি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব এর খেদমতের কথা বলে থাকেন কিন্তু তিনি যে আহমদী ছিলেন সে কথাটা শ্রোতাদের বলেন না। আমরা তাদেরকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তারা বলে থাকেন, আমরা শ্রোতাদের শান্ত রাখার জন্য এমন করি। হুযূর মুফ্তি সাহেব-এর কার্যক্রমের সফলতাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আমরা কী করতে পারি?

হুযূর (রাহেঃ) বলেন, এই যে লোকটা উত্তর দিয়েছিল যে, জনতাকে শান্ত রাখার জন্য (তারা যেন আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উচ্চ বাচ্য না করে) মুফ্তি সাহেব-এর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করি না, এ উত্তরটা কান্ডজ্ঞান বিবর্জিত। এতে বিবেক বুদ্ধির কোন গন্ধ পর্যন্ত নেই। হুযুর বলেন, সঠিক উত্তর হ'ল ঐ সব বক্তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন।

দ্বিতীয়তঃ বক্তার যে আশঙ্কা শ্রোতারা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে কিছু খারাপ কথা বলবে-এর উত্তর হচ্ছে, আপনারা এমন বক্তাদেরকে বলুন তারা যেন আমাদের জামাতের নাম উল্লেখ করেন তারপর দেখা যাবে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আমরা তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিব।

হুযূর (রাহেঃ) বলেন হযরত মুফ্তি সাহেব সম্পর্কে বেশি বেশি বলাই তাঁর কার্যক্রমকে পুনর্জীবিত করার উত্তম পন্থা।

প্রশ্ন নং ২ঃ হুযূর কুরআন করীমের ১০ নম্বর সূরা (ইউনুস) আয়াত ৯১-৯৩তে বলা আছে যে ফেরআউনের দেহ সংরক্ষণ করে তাকে নিদর্শন বানানো হবে। হুযূর এ নিদর্শন বানানোর তাৎপর্য কী? আর এক প্রশ্ন হচ্ছে, মাত্র এক ফেরআউন-এর দেহ সংরক্ষণ করা হয়েছিল না অনেক ফেরআউনের দেহ-সংরক্ষণ করা হয়েছিল?

হুযূর উত্তরে বলেনঃ প্রথম কথা হ'ল এ আয়াতে শেষ যুগের মানুষের জন্য ফেরআউনের দেহকে নিদর্শন হিসাবে পেশ করার কথা ছিল। আর এই ফেরআউনের দেহ সম্পর্কে ওহীতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তার শরীরকে সমুদ্রে ধ্বংস হতে দিবেন না এবং পরবর্তীকালের মানুষের জন্য ঐটাকে সংরক্ষণ করা হবে। হুযূর বলেন, এই কথাটা মহানবী (সঃ)-কে তখন কে বলেছিলেন? নিশ্চয়ই আল্লাহ্তাআলা ওহী করে তাঁকে বলেছেন, ফেরআউনের শরীরকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হুযূর বাইবেল-এর বরাতে বলেন, বাইবেল-এ ফেরআউনের ঘটনা যেভাবে লেখা আছে বাইবেল বলে ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে গেছে এবং চিরতরে হারিয়ে গেছে। মিটে গেছে, তার কোন অস্তিত্বও অবশিষ্ট নেই। পাশ্চাত্যের অনেক পন্ডিত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সম্বন্ধে এই অপবাদ উঠিয়ে থাকেন, তিনি কারও কাছ থেকে শিখে বা বাইবেল থেকে নকল করে মানুষকে কুরআনের আয়াত বলে শুনিয়ে থাকেন। অর্থাৎ বাইবেলে যে যে শিক্ষা আছে সে শিক্ষা মুহাম্মদ (সঃ) কুরআনের আকারে দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন। হুযূর বলেছেন, যদি রসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর বিবরণ (নাউযুবিল্লাহ্!) বাইবেল থেকে চুরি করতেন আর আল্লাহ্তাআলার পক্ষ থেকে না আসতো তো হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ) বাইবেল যা লিখেছিল তা-ই কুরআন করীমে বর্ণনা করতেন। কিন্তু মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিবরণ বাইবেল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বাইবেল বলছে ফেরআউন সমুদ্রে ডুবে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু কুরআন করীম তা বলছে না। আল্লাহ্ তাঁকে সংরক্ষণ করবেন যে, সে অবস্থায় মারা যাবে না। পরবর্তী যুগের জন্য সে নিদর্শন হবে। এটা কুরআন করীমের সত্যতার একটি বড় প্রমাণ। হুযূর বলেন, এর মাধ্যমে তিনটি কথার প্রমাণ হয়ঃ প্রথম কথা হ'লঃ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বাইবেল থেকে কোন কিছু নেন নি। দ্বিতীয় কথা হ'লঃ সে যুগের মানুষ এ বিষয়ে কোন কিছু জানত না। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তাঁকে আল্লাহ্তাআলা অবহিত করেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর যুগের ফেরআউনের সাথে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর তিন নম্বর কথা হ'ল সে ফেরআউন যে হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছিল সে মারা যায় নি। সে জীবিত ছিল। নিঃসন্দেহে এটি কুরআন করীমের সত্যতার একটি প্রমাণ।

ফেরআউন তখন মারা যায় নি। তারপর সে দীর্ঘকাল জীবিত ছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু দাওয়া করতে গিয়ে সে সমুদ্রে পানির নীচে চলে গিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে সে নব্বই (৯০) বৎসর জীবিত ছিল কিন্তু সুস্থ অবস্থায় নয়; বিছানায় শায়িত অবস্থায় জীবন কাটিয়েছে এবং অসাধারণ কষ্ট পেয়েছে। বহু কাল পর তা মৃতদেহ আবিস্কৃত হয়েছে। আর আবিষ্কার কারা করেছে যারা ইসলামের এবং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর শত্রু ছিল এবং তারা প্রমাণ করেছে যে, এ ফেরআউন সে ফেরআউন, যে হযরত মূসা (আঃ)-এর পিছু ধাওয়া করেছিল তাঁকে ধ্বংস করার জন্য। নিঃসন্দেহে এটি কুরআন করীমের সত্যতার একটি বড় প্রমাণ এবং এতে পরবর্তী মানুষের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

প্রশ্ন নং-৩ঃ হুযূর, একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে,"আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যুদ্ধ করতে যে পর্যন্ত না তারা সত্যকে গ্রহণ করে"। হুযূর এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগত ইসলাম সম্পর্কে একটি নেতিবাচক প্রশ্ন উত্থাপন করে। হুযূর কী বলেন?

হুযূর বলেন, আমি এ বিষয়ে আগেও অনেক বার আলোকপাত করেছি। এ হাদীসের এমন কোন অর্থ করা যাবে না যা কুরআন করীম-এর আসল ও সত্যিকারের শিক্ষার বিরোধী হয়, যা কুরআনের আয়াত লা ইকরাহা ফিদ্দীন এর বিরুদ্ধে যায়। এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, ইসলাম মানুষকে হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে। এ রকম ব্যাখ্যা করলে কুরআনের বিরুদ্ধে বলা হবে। হুযূর বলেন, এই আয়াতের অর্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রে যারা মুসলমানদেরকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুসলমানদের বসতি এলাকার কাছে এসে

গেছে তাদেরকে একটা সুযোগ দেয়া। শুধু যুদ্ধ ক্ষেত্রে একটা ছাড় দেয়া হচ্ছিল। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলছেন তোমরা মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে এসেছো এমন অবস্থায়ও মুসলমানদের জন্য নির্দেশ হ'ল, এ অবস্থায়ও যদি কোন যোদ্ধা যুদ্ধের ময়দানে বলে, আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম তো এমন অবস্থায়ও তোমরা তাদেরকে নিহত করতে পারবে না। তাদেরকে ছাড় দেয়া হচ্ছে। কারণ এ পরিস্থিতির জন্য তারা নিজেরা দায়ী। সে পরিস্থিতিতেও যদি কেউ কপটতাবশতঃ বলে আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। তাহলেও তার ওপর কোনভাবে তরবারি উঠানো যাবে না। এটা হাদীসের দ্বিতীয় ধরনের অর্থ।

আর পরাজিত হওয়ার সময় যদি কেউ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে তাহলেও কারও এ কথা বলার অনুমতি নেই, "তুমি সত্যিকার অর্থে ইসলাম গ্রহণ কর নি। তুমি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিশ্বাসী নও। হুযূর আরও বলেন, এমন পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন. তোমরা এমন লোককেও হত্যা করবে না।

সেই ব্যক্তি যে মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য এসেছিল তাকে ছাড় দেয়া হ'ল, সুযোগ দেয়া হ'ল যে, নিজের এলাকায় কোন সময় গিয়ে বলতে পারে। সে নিজের এলাকায় ফিরে যেতে পারে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে ছাড় দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ হুযূর বলেন, মুসলমানদের জন্য এতে একটা শিক্ষনীয় দিক হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তুলে ধরেছেন আর তা হ'ল, কোন মুসলমান ভাইকে তুমি হত্যা করবে না। কোনভাবেই মুসলমান ভাইকে হত্যা করা যাবে না। হতে পারে তার মধ্যে সত্যিকারের ইসলাম নেই। ঈমানের সাথে সে ইসলাম গ্রহণ করে নি। সে তার প্রাণ রক্ষার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছে। এমন অবস্থায়ও মুসলমানের জন্য শিক্ষা হ'লঃ এমন ব্যক্তিকেও হত্যা করা যাবে না। হুযূর বলেছেন, আরও একটি দৃষ্টান্ত আছে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে শিখিয়ে গেছেন। এক যুদ্ধে এক শক্তিশালী ইসলাম বিরোধী যুদ্ধাকে এক মুসলমান যুদ্ধা পরাস্ত করেছিলেন। এক পর্যায়ে যখন তাকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন তখন সে যুদ্ধা বললো, আমি এখন ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমাও পড়ল। তার এই কলেমা পড়া সত্ত্বেও মুসলমান যুদ্ধা বিরোধী যুদ্ধাকে হত্যা করে ফেল্লেন। পরবর্তীতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর কাছে বড় গর্বের সাথে বললেন হুযুর, আজকে এমন এক যুদ্ধাকে আমি হত্যা করেছি যে ভয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়েছে। তিনি আশা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তার এই কাজের প্রশংসা করবেন। কিন্তু সেই সাহাবী নিজেই বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)কে পূর্বে আর কখনোই এত ক্রোধান্বিত দেখি নি। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পবিত্র চেহারা রক্তিম বর্ণের হয়ে যায় এবং হুযূর (সঃ) বার বার আমাকে বলেন, "তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছো, তুমি কি তার বক্ষ চিরে দেখেছিলে যে, সে অন্তর থেকে আন্তরিকভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ছিল কি না? কেন তুমি তাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়ার পরও হত্যা করলে? তুমি তার হৃদয় উঁকি মেরে দেখেছো? এ সাহাবী বলেন,হুযূর (সঃ) এ কথাকে এত বার পুনরাবৃত্তি করেন, যে আমার তখন মনে হ'ল হায়! যদি আমি আজই মুসলমান হতাম তা হলেই হয়তো আমার জন্য মঙ্গল হ'ত এবং আল্লাহ্র রসূলের এত ক্রোধ আজকে আমাকে দেখতে হ'ত না। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরও বলেছিলেন , যখন তার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করা কেয়ামতের দিন তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে তখন তুমি কি করবে? হযরত আমীরুল মুমেনীন বলেছেন, ইহা ইসলামের অসাধারণ ম ং ইসলামী শিক্ষার অসাধারণ সৌ সাধারণ আকর্ষণীয় দিক তুলে ধরে। এ হাদীস ইসলামকে অসুন্দর করে না বরং এই হাদীসে রসূলে করীম (সঃ) তাদেরকেও ছাড় দিয়েছেন যারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্যে যুদ্ধ করতে এসেছে।

প্রশ্ন নং ৪ঃ সূরাতুল বাকারার ৩৬ নম্বর আয়াতে যে গাছের কাছে যেতে আদম ও হাওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে এই গাছের তাৎপর্যটি কী?

হুযূর (রাহেঃ) বলেন, সেটা বোঝাবার জন্য কুরআন করীমের আর একটি আয়াতের সাহায্য লাগবে। সেখানে দু'ধরনের বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে একটা হচ্ছে নোংরা অপবিত্র বৃক্ষ আর একটি হ'ল শাজারাতে তায়্যিবাহ্ বা পবিত্র বৃক্ষ। অপবিত্র বৃক্ষের দৃষ্টান্ত বা অপবিত্র বৃক্ষ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুযূর বলেন, এমন বৃক্ষের মূল মাটির গভীরে থাকে না উপরের স্তরে থাকে অল্প বাতাসেই এ বৃক্ষ উপড়ে যায়। আর দ্বিতীয় অর্থ হ'ল এদের কোন দৃঢ় আস্থা বা Stand থাকে না। এরা ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন করতে থাকে। আল্লাহ্তাআলার আদেশকে সব সময় উপেক্ষা করতে থাকে, লংঘন করে, জলাঞ্জলি দেয়। আর অপবিত্র বৃক্ষের-এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এরা নোংরা ও অপবিত্র ফল বহন করে। এর অর্থ হ'ল শরীয়তে মানুষের উপকারের যে দিক সে দিকগুলো তারা অনুসরণ করে না। তারা সব সময় শরীয়তের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। এমন অর্থ করে যা মানুষকে সত্য থেকে দূরে রেখে দেয়। তাই হুযূর বলেন, আল্লাহ্ নসিহত করেন (আদম ও হাওয়াকে) তোমরা এই ধরনের মানুষ থেকে দূরে থাকবে। তাদের সাথে উঠা-বসা করবে না, মেলা মেশা করবে না। তাদের সাথে কোন সংস্রব বা যোগাযোগ রাখবে না। কারণ এদের সাথে যোগাযোগ রাখলে তোমাদের মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যাবে। এ বৃক্ষের বরাতে আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে আদম ও হাওয়াকে এ আদেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন নং ৫ঃ হুযূর, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনি গিয়েছেন এবং বড় বড় নেতাদের সাথে আপনার দেখা হয়েছে। হুযূর আমি জানতে আগ্রহী আপনি কোন নেতাকে সত্যের কাছাকাছি পেয়েছেন? ইসলামে নিকটে বা সঠিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছেন?

হুযূর বলেন, এমন মানুষ আমি খুব কম পেয়েছি। আমি কারও নাম ঠিক এ মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।

প্রশ্ন নং- ৬ঃ একটি হাদীসে আছে, আল্হারবু খূদয়াতুন, দয়া করে এই হাদীসটির একটু ব্যাখ্যা করুন।

হুযূর বলেন, যুদ্ধের কলা-কৌশলের ব্যাপার একেবারে ধোঁকা দেয়ার শিক্ষা নয়, তবুও ইসলামে এরকম কলা-কৌশল অবলম্বনের অনুমতি আছে। এটি মিথ্যা নয়। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জীবনে এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই। একবার তিনি (সঃ) কোন এক দিকে যুদ্ধের জন্য বের হচ্ছিলেন তার সঙ্গে পথে এক ব্যক্তির দেখা হ'ল। হুযূর (সঃ)-এর বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যক্তি যদি জানে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি তখন এ কথা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং অসুবিধা হ'তে পারে। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) একটি রাস্তা

বের করলেন। তিনি (সঃ) তাকে সুন্দরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে জনপদ সেখানে যাওয়ার রাস্তা কোন্‌টি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) নিজে যেদিকে যাচ্ছিলেন তার নামই নেন নি। অন্য একটি জায়গার কথা জিজ্ঞেস করলেন। সে ব্যক্তি হুযূর (সঃ)-কে রাস্তা বলে দিল। কিন্তু শত্রুর কাছে গিয়েও খবরটা দিল ঠিক যে রকম রসূলুল্লাহ্ (সঃ) পূর্বেই অনুমান করেছিলেন যে মুহাম্মদ (সঃ) ঐ দিকে যাচ্ছেন। তার এ খবর শুনে শত্রুও ঐ দিকে রওয়ানা দিল। আর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কোন সঠিক খবর তারা পেল না য, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁর সাথী ও সঙ্গীদের নিয়ে কোথায় গেলেন। তাই এ ধরনের কলা-কৌশল যুদ্ধে অলম্বন করা যায়। এটা মিথ্যা নয়। আর হুযূর (সঃ)-এর জীবনে এর প্রমাণ আছে।

প্রশ্ন নং ৭ঃ হুযূর একই রকম মাটির উৎপন্ন ফল শাক-সব্জির স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন হয়। এর রহস্য কী?

হুযূর বলেন, এইটাই তো আল্লাহ্‌র মহিমা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ। একই মাটি থেকে একটা গাছ জন্মাচ্ছে কিন্তু সে একই গাছের স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। আবার সেই একই মাটি থেকে ভিন্ন ধরনের শাক উৎপন্ন হচ্ছে। এসব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ। সব সৃষ্টির পেছনেই আল্লাহ্‌তাআলার একটা মহান, অসাধারণ উদ্দেশ্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তোমার আব্বা যে কাঁঠাল নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। কাঁঠাল সম্পর্কে একটা কুসংস্কার আছে যে, যে বাহনে করে কাঁঠাল আসে সেটা (রিক্‌শা কার, বাস) বিকল হয়ে যেতে পারে। এ কাঁঠাল অদ্ভুত একটি ফল যে, গাছের মূল কান্ডের ওপর লেগে থাকে, গাছের শাখায় লাগে না। এমন আর কোন ফল পৃথিবীতে দেখা যায় না। এ ফল এত ভারী হয় যে, শাখায় ধরলে তো সেই শাখাই ভেঙ্গে পড়ে যেত। আর নীচে কোন লোক থাকলে তার মাথায় প্রচন্ড আঘাত লাগতো। সে কারণেই আল্লাহ্‌তাআলা এই ফলটিকে গাছের মূল কান্ডের সাথে লাগার বিধান করেছেন। আর কাঁঠালের সে অংশটা গাছের সাথে লেগে থাকে সে অংশটা অত্যন্ত মজবুত হয়। এতই মজুত যে মানুষ দূরদুরান্ত এলাকা থেকে এই ফলটিকে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। কোন অসুবিধাই হয় না। হুযূর বলেন, এ সব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌তাআলার অস্তিত্বের অসাধারণ একটি প্রমাণ বহন করে।

প্রশ্ন নং ৮ঃ হুযূর আমরা ফিরিশ্‌তাতে বিশ্বাস করি। তারা মানুষের জীবনের উপর কী কী প্রভাব দেখতে পারেন?

হুযূর বলেন, ফিরিশ্‌তারা শুধু আল্লাহ্‌তাআলার আদেশ পালন করেন। নিজেরা কিছু করতে পারেন না। আপনি ভয় পাবেন না। তারা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।

প্রশ্ন নং ৯ঃ হুযূর, ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বাবর নিজের ছেলের (হুমায়ূনের) জীবন বাঁচাবার জন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট নিজের জীবন পেশ করে পুত্রের দীর্ঘ জীবন চেয়ে ছিলেন। হুযূর কি এভাবে দোয়া করা জায়েয মনে করেন?

হুযূর উত্তর দেন ঃ বাবরকে উপদেশ দেয়ার সময় তো পার হয়ে গেছে তবুও বলছি যে, দোয়াটা এভাবে করা উচিত ছিল যে, হে আল্লাহ্! আমার ছেলেকে সুস্থ করে দাও, দীর্ঘ জীবন দান কর, আমাকেও দীর্ঘ জীবন দাও যেন আমার ছেলেকেও সুস্থ দেখতে পাই। এটা হ'ল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে কিংবা তাঁর নিকট কোন পসন্দনীয় জিনিসের বিনিময়ে হুমায়ূনের স্বাস্থ্য পুরুদ্ধারের থাকতো তখন বাবর দোয়া করতেন পারতে, হে আল্লাহ্! যদি আমার ছেলেকে সুস্থ করার জন্য তুমি আমার সবচে' প্রিয় জিনিসটি চাও তা-ও আমি দিতে প্রস্তুত এবং তা হ'ল আমার জীবন। এভাবে দোয়া করলে সুন্দর হত!

প্রশ্ন নং ১০ ঃ হুযূর যারা "নোবেল পুরস্কার" পান তাঁরা বেশির ভাগ পাশ্চাত্যের লোক হন। এ ব্যাপারে কি পক্ষপাতিত্ব হয়ে থাকে?

হুযূর বলেন, না আমার তা মনে হয় না। পাশ্চাত্যে বিজ্ঞানে সেবা এবং অসাধারণ কাজ করার সুযোগ বেশি আছে। তাদের অধীকার ও যোগ্যতা রয়েছে তাই তারা "নোবেল প্রাইজ" বেশি পান। তাছাড়া পাশ্চাত্যে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ব্যক্তিরাও নোবেল প্রাইজ পায়। তাদের সত্যিকার যোগ্যতা আছে বলেই পায়। আমার মনে হয় পক্ষপাতিত্ব হয় না।

প্রশ্ন নং ১১ঃ হুযূর, আজকাল আমাদের দেশে (বাংলাদেশে) হুযূরের জুমুআর খুতবা মাগরিব-এর নামাযের সময় আসে। এমতাবস্থায় আমরা কি সময় মত মাগরিব-এর নামায পড়বো না প্রথমে হুযূরের খুতবা শুনে পরে নামায পড়বো?

হুযূর বলেন, সময়মত মাগরিব-এর নামায পড়ুন তার পর যতটা খুতবা পান তা-ই শুনুন।

প্রশ্ন নং ১২ঃ হুযূর আমরা যে আপনাকে চিঠি লিখি তার উত্তর অনেক সময় আপনি দিয়ে থাকেন অনেক সময় আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব দিয়ে থাকেন। মানে কখনও আপনার স্বাক্ষর থাকে কখনও অন্য কারও স্বাক্ষর থাকে। এর মধ্যে তফাৎটা কী?

হুযূর বলেন, কোন কোন চিঠিতে মৃত্যু সংবাদ থাকে। পত্রলিখক এর পিতা-মাতা ভাই-বোন মারা গিয়ে থাকতে পারে। এসব ক্ষেত্রে আমি নিজে তাদেরকে সহানুভূতির পত্র লিখে থাকি। আমার স্বাক্ষরসহ তাদেরকে চিঠি লিখি। আবার কারও যদি দীর্ঘ কাল পর সন্তানের জন্ম হয় তখন বাবা মাকে মোবারকবাদ জানাই। তখনও আমার দস্তখতসহ চিঠি দেই। আবার বিয়ের ক্ষেত্রে সফল জীবন যাপন করছে তাদেরও আমার দস্তখত এর সাথে চিঠি পাঠিয়ে থাকি। অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমার নিজের দস্তখতসহ চিঠি দেয়া উচিত আমি তা-ই করে থাকি।

আর সাধারণ চিঠি তো আমার কাছে অনেক অনেক আসে। প্রত্যেকটির উত্তরে যদি আমি নিজে দস্তখত করতে যাই তবে আমার দিনের অর্ধেক সময় তো শুধু চিঠিতে দস্তখত করতেই চলে যাবে। তাই আমি প্রাইভেট সেক্রেটারীকে বলে থাকি যে, সাধারণ দোয়ার যে সব পত্র এসে থাকে তাদের লেখকদিগকে আপনি আমার পক্ষ থেকে চিঠি লিখুন।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ হুযূর নবী করীম (সঃ) বলেছেন নামাযীর সামনে দিয়ে যাবে না। যদি চল্লিশ বছর অপেক্ষা করতে হয় তবুও অপেক্ষা কর। তার নামায সমাপ্ত হলে তারপর সামনে দিয়ে যাও। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)খুব জোর দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। এর আসল কারণ কি ছিল?

হুযূর উত্তর দিলেন-এর কারণ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, নামাযের সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে অত্যন্ত সজাগ থাকতে হবে।

সংকলন ও অনুবাদ

মরহুম আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

GOD WAS LISTENING

Who said God wasn't listening
When we all cried in pain
He was listening carefully listening
And was waiting till again
We'll pack all of our troubles
And carry this huge pile
And knock at lord's door
To get the gift of smile
He loves us and to show this
He puts us through hard tests
And when we feel distress
He gives us what is best
Lord has his own nice way
And to show how much he cares
He tells us to hold his hand
So we Feel safe in his care
So if someone just stops praying
Thinking that the god wasn't listening
Then tell them they are wrong
As the lord was only waiting
Till we packed all our troubles
And carried this huge pile
And knocked at lords door
To get the gift of a smile.

-Seema Chowdhury

আল্লাহ্ শোনেন

কে বলে মানুষ যখন কষ্টে থাকে তখন আল্লাহ্ শুনতে পায় না
যখন আমরা কষ্ট পেয়ে কাঁদি
তিনি তখন আমাদের দোয়া শোনেন
এবং অপেক্ষা করবেন সে সময়ের জন্য
যে সময়ে আমরা তাঁকে আমাদের কষ্টের কথা জানাই
আল্লাহ্র দরজায় কড়া নাড়ি
যেন আল্লাহ্ আমাদের কষ্টের বিনিময়ে সুখ দেন
আল্লাহ্ কখনও কখনও বান্দাকে পরীক্ষায় ফেলেন
এমনকি বান্দাকে কষ্ট দিয়ে দেখেন
এবং যখন আমরা তাঁর কাছে দোয়া চাই
তখন তিনি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন
আর যখন আমরা তাঁর নিকট দোয়া করি
তাঁর দুয়ারে যখন হাত তুলি
তখন তিনি আমাদের হাত ধরে সযত্নে নিরাপদ
জায়গায় পৌঁছে দেন
কেউ যদি বলে আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শোনেন না
তখন তাকে বলো কথাটি সঠিক নয়
আল্লাহ্ আমাদের ডাক শোনেন এবং অপেক্ষা করেন
যখন বান্দা তাঁকে কষ্টের কথা শোনায়
তখন তিনি তার বদলে সুখ দেন

ভাষান্তর-ফায়েজা হোসেন

রঘুনাথপুর বাগে লাজনা ইমাইল্লাহ্র ১ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত রঘুনাথপুর বাগে ১ম বার্ষিক লাজনা ইমাইল্লাহ্র ইজতেমা গত ০৭-০৮-২০০৫ইং নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম, লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, স্মৃতি শক্তি, পরীক্ষা পয়গামে রেসানী ও খেলাধুলা সহ মোট ৪টি গ্রুপে ২২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। ৮ই নভেম্বর বেলা তিনটায় স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রেসিডেন্ট সাহেবার সভাপতিত্বে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয়।

মোসাঃ মনোয়ারা বেগম
প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্, আ. মু.জা. রঘুনাথপুর (বাগ)

শুভ বিবাহ

❖ গত ১১/০৪/২০০৫ইং জনাব এনাম খানের কন্যা, মোসাম্মাৎ আসমা আহমেদ মৌলভী পাড়া বি-বাড়ীয়া এ সাথে জনাব আব্দুল ওয়াহেদ এর পুত্র জনাব মাহফুজুর রহমান সাং গ্রাম তারুয়া পোঃ ঐ জেলা বি-বাড়ীয়া এর বিয়ে ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় ধার্য হয়।
রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৫০৪/০৫

❖ গত ২৮/০১/০৫ইং জনাব মোহাম্মদ ফয়েজউল্লাহ্ এর কন্যা, মোসাম্মাৎ নীলুফা ইয়াসমিন (নীলু) ২০৬/১ ফকিরাপুল/ মতিঝিল ঢাকা। এর সাথে জনাব মোবারক আলী এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ১২/সি, ১২/১৭ পল্লবী মীরপুর ঢাকা এর বিয়ে ১,৫০,০০১/-(এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়।
রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৫০৫/০৫

❖ গত ০৪/০৫/০৫ ইং জনাব আবুল হোসেন মন্ডল এর কন্যা, মোসাম্মাৎ রোজিনা ইয়াসমিন সাং- আয়ের হাট, পোঃ বাঘা রাজশাহী এর সাথে জনাব মরহুম মজনু মিয়া এর পুত্র জনাব মনির উদ্দিন (বাদল) ২৮৯, পূর্ব নাখালপাড়া তেজগাঁ ঢাকা এর বিয়ে ৫০,০০১ (পঞ্চাশ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়।
রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৫০৬/০৫

❖ গত ১১/০১/০৫ইং জনাব আব্দুর রশিদ বেগ এর কন্যা মোসাম্মাৎ শামীমা খাতুন সাং তে-বাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া, নাটোর এর বিয়ে জনাব আশরাফ আলী এর পুত্র জনাব রুহুল ইসলাম সাং মশীনদা পোঃ পাঁ বাড়ীয়া, নাটোর এর সাথে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়।
রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৪৮২/০৫

❖ গত ১২/১২/০৪ ইং মোস্তফা পাটোয়ারী এর কন্যা মোসাম্মাৎ মনিরা ছিদ্দিকা (রীমা) সাং চরদুখিয়া পোঃ গন্ডামারা, ফরিদগঞ্জ এর বিয়ে জনাব মরহুম জাকিউদ্দিন আহমদ এর পুত্র এস, এ, এম, নাজির সাং ৬/৩ পাওয়ার হাউজ রোড, ময়মনসিংহ এর সাথে ৭৫,০০১ (পচাত্তর হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়।
রেজিষ্ট্রেশন নং- ০৪৮৩/০৫

সৌজন্যে-সেক্রেটারী রিস্তানাতা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ।

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরা ১

নীচতলা

রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১

গুলশাল ২ ঢাকা ।

ফোন ঃ ৯৮৮২১২৫

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা

(রূপা প্লাজার পার্শ্বে)

ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

পাক্ষিক আহমদীর অব্যাহত অগ্রযাত্রায় আমাদের অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217

Phone : 414550, 9331306

New Vol. No. 68 ❑ 10th Issue November 30, 2005. ❑ Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজি ঃ নং-ড়ি, এ-১২

জার্মানীতে বায়তুল-আ'লীম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road,
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge: Mahbub Hossain, National Secretary Ishaat
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925 E-mail: amgb@bol-online.com